দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বর্তমান সমাজ দর্শনের প্রেক্ষিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
— পৃঃ ৩১

৭৮ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭
website : www.eswastika.com

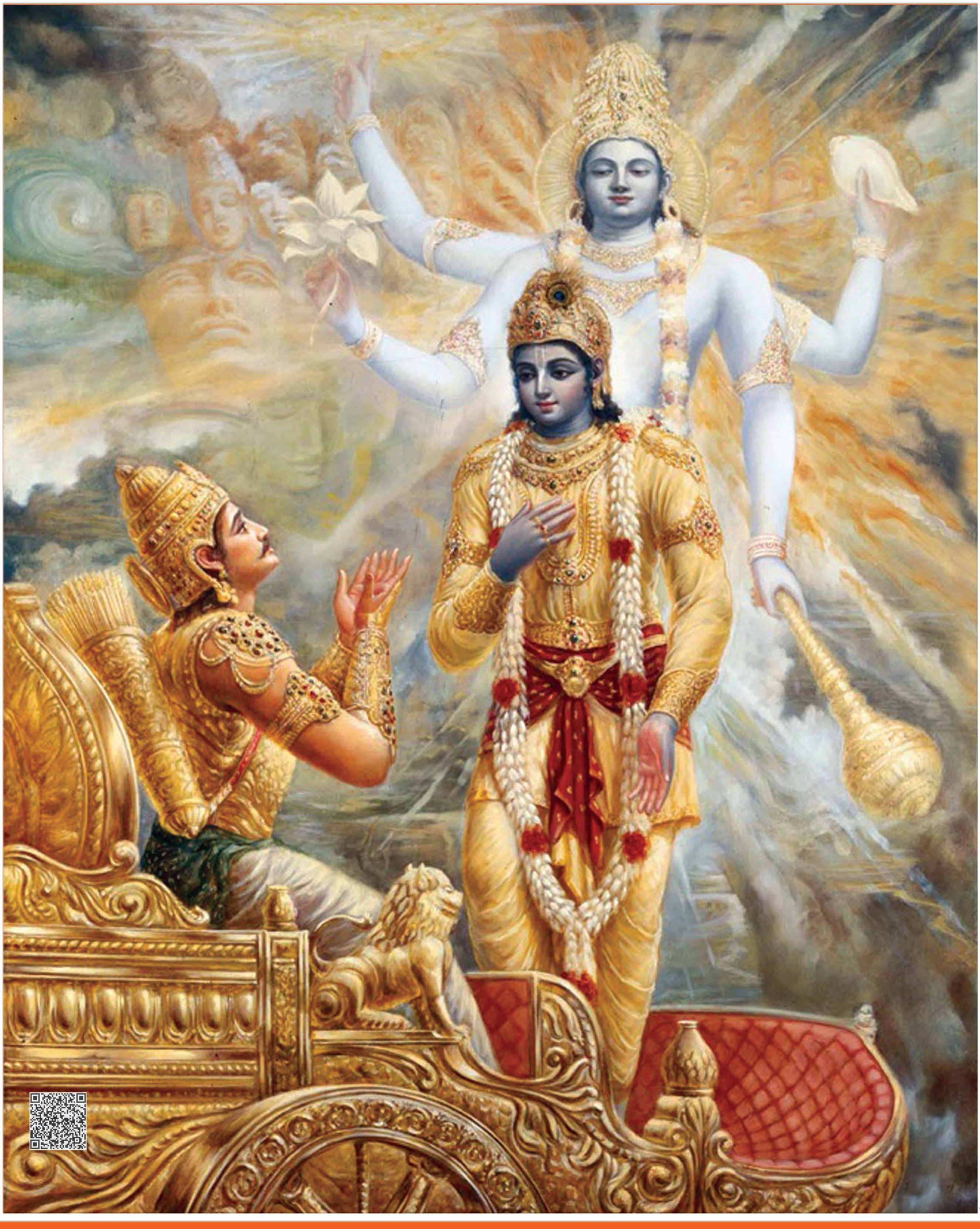

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৮ ডিসেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

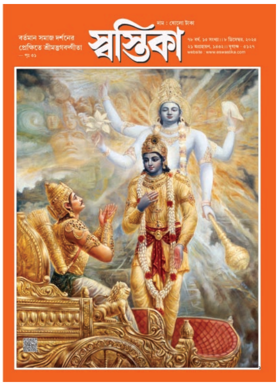

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

হিন্দুবিরোধীদের বড়ো বিপদ ‘এসআইআর অঙ্কুশ’, তাই হাঁসজারুরা একসুর : ঘোগের বাসা ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

গরম গরম রুটি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

বেআইনি অনুপ্রবেশের সব দায় কী রাজ্যের শাসক দলের নয়?
◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ৮

গীতা জননীর শরণাপন্ন হলে বঙ্গভূমির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী
◻ কৌটিল্য ◻ ১০

বিহার নির্বাচনে বাম-মাওবাদী দলগুলিকে প্রস্থানের দরজা দেখিয়ে দিয়েছে বিহারের জনতা ◻ দেবযানী ভট্টাচার্য ◻ ১১

সন্ত্রাস রপ্তানির তত্ত্ব—মহিলারা এখন জঙ্গিদের জন্য সুলভ
◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১৪

হিন্দুত্বের সংজ্ঞা—বর্তমানের প্রেক্ষিতে
◻ শ্রী অরুণ কুমার ◻ ১৬

সঙ্ঘ-শক্তি তৃণভূমে : বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ ◻ বিদ্যুৎ মুখার্জি ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৫

বর্তমান সমাজ দর্শনের প্রেক্ষিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
◻ উদয়ন চক্রবর্তী ◻ ৩১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিটি অধ্যায় ক্রিয়াযোগাধ্যায়
◻ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩৪

জগজ্জননী মা সারদা ◻ বৈশাখী কুণ্ডু ◻ ৩৬

শক্তিরূপিণী মা সারদা ◻ সুতপা বসাক ভড় ◻ ৩৮

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে—নোয়াখালির কসাই
◻ অধ্যাপক (ড.) স্বাগত বসু ◻ ৩৯

সাক্ষাৎকার : ‘গীতানুরাগীদের অভিনব জনসমুদ্রের মাধ্যমে ব্রিগেডের মাঠে সৃষ্টি হতে চলেছে নতুন ইতিহাস’— শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ ◻ ৪৩

আফগানিস্তানে হিন্দু-শিখদের যে প্রয়োজন তা বুঝেছে তালিবান সরকার ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৮

বিধানসভা ভোটের আগে বাবরি বিতর্ক! ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻

সংবাদ প্রতিবেদন : ২৩ ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৪, ২৮-৩০** ◻

নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
১৫ ডিসেম্বর
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১৫ ডিসেম্বর
২০২৫

বিপ্লবীদের স্মরণে

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী বহু বিপ্লবীর জন্ম ও আত্মবলিদানের মাস ডিসেম্বর। তাঁদের স্মরণ করা প্রতিটি দেশবাসীর দায়িত্ব।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় তাঁদের স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে থাকছে কিছু জেহাদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বানানোর গল্প, বঙ্গের নবজাগরণের বাস্তবতা ও মিথ, ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দলের মিথ্যা গল্প। এইসব বিষয়ে থাকবে কয়েকটি মননশীল রচনা। লিখবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

সম্পাদকীয়

বিশ্ব মানবের পথনির্দেশিকা

ভারতীয় জীবন দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । ইহা মোক্ষকামী প্রতিটি মানুষের জীবনচর্যার ব্যবহারিক পথনির্দেশিকা। এই মহাগ্রন্থটি সংস্কৃত মহাকাব্যের অন্তর্গত হইলেও একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে মর্যাদা পাইয়া থাকে। শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া ইহাকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলা হইয়া থাকে। বেদাদি উপনিষদে প্রায় একই প্রকার শ্লোক রহিয়াছে, সেইহেতু গীতাকে গীতোপনিষদও বলা হইয়া থাকে। উপনিষদের শিক্ষার সারবস্তু গীতায় সংকলিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে উপনিষদেরও উপনিষদ বলা হইয়া থাকে। সমুদয় হিন্দু গীতাকে মোক্ষশাস্ত্র মনে করিয়া থাকেন। গীতায় বিশ্বমানবের জীবন, কর্ম, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার গভীরে নৈতিক ও দার্শনিক অনুভূতিগুলির উপরে আলোকপাত করা হইয়াছে। গীতার জ্ঞান মনুষ্যকে সমস্ত রকমের বিভ্রান্তি ও দ্বিধা হইতে উত্তরণ করিয়া জীবনের পথ নির্দেশ করিয়াছে। ইহার মূল বিষয়বস্তু হইল ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম বিষয়ের এক নির্দেশনা; নৈতিক সংকট হইতে মুক্তি এবং জীবনের গভীরে দার্শনিক ধারণা যাহা সম্মিলিতভাবে আত্মা ও পরমাত্মার ধারণা পরিস্ফুট করিয়াছে। এককথায়, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে থাকা মনুষ্যকুলের পথপ্রদর্শক এবং জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিশাস্ত্র। এই মহাগ্রন্থের মূল সিদ্ধান্ত হইল, আত্মা শাশ্বত, তাই কেউ হত হন না বা কাহাকেও হত করা যায় না। শরীরের লয় ঘটিলেও আত্মা অবিনশ্বর। গীতাশাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে কর্তব্য কর্মকেই 'ধর্ম' বলা হইয়াছে, আর এই ধর্মকে কোনোভাবেই অবহেলা করা নয়। নিষ্ক্রিয়তার অর্থই হইল মৃত্যু আর সক্রিয়তার অর্থ হইল জীবন। গীতার প্রতিটি অধ্যায়ের, প্রতিটি শ্লোকের, প্রতিটি বাক্যের অন্তর্নিহিত ভাব হইল, যুক্তি ও জ্ঞানকে লক্ষ্যপথে পরিচালিত করিয়া দৈনন্দিন জীবনে সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত প্রকার জড়তা হইতে মুক্তি লাভ।

বহু শতাব্দী প্রাচীন হইলেও গীতাজ্ঞান অদ্যাবধি সমুদয় বিশ্বমানবের জন্য সমান প্রাসঙ্গিক। ইহার প্রধান শিক্ষা 'ধর্ম' অর্থাৎ কর্তব্যের ধারণাকে বেষ্টন করিয়াই। ভারতবর্ষের বাহিরেও বহু পাশ্চাত্য মনীষী শুধু এই মহাগ্রন্থের প্রশংসাই করেননি, তাহার শিক্ষা অনুসারে জীবন পরিচালনা করিয়াছেন। উপসনা পদ্ধতিতে ভিন্ন হইলেও পূর্বতন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম নিত্য গীতাপাঠ করিতেন এবং তাহা হইতে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করিতেন। তিনি তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় গীতা হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষী গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আদি শঙ্করাচার্য অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, যদি কেহ ভগবদ্গীতার নির্দেশাবলী অন্তর দিয়া অনুসরণ করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি জীবনের সমস্ত দুঃখ, উদ্বেগ ও ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে তাঁহার ভাষ্য রচিত হইলেও আজও সমান জনপ্রিয়। লোকমান্য তিলক তাঁহার গীতারহস্যে শ্রীমদ্ভবদ্গীতাকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়া জীবনকে সৎকর্মের মধ্যে ব্যাপৃত রাখিবার কথা বলিয়াছেন।

আজ যখন সমগ্র বিশ্ব সন্ত্রাস, জেহাদ প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত, তখন গীতাজ্ঞানই সমগ্র বিশ্বকে শান্তির পথ প্রদর্শন করিতে পারে। ভারতবাসীর মহাভাগ্য যে তাহারা এই মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশ্ববাসীও ইহা হইতে বঞ্চিত নহেন। বিশ্বব্যাপী পঁচাত্তরেরও অধিক ভাষায় গীতা অনূদিত হইয়াছে। শুধুমাত্র ইংরাজি ভাষায় তিনশতের অধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দের বিষয় যে, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ মানুষের মনে এই ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থসংক্রান্ত আগ্রহ নির্মাণের জন্য বঙ্গভূমিতেও সমবেত গীতাপাঠের আয়োজন চলিতেছে। সন্ত্রাস প্রতিরোধ এবং সমাজের সার্বিক জাগরণও এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। এই বৎসরও সনাতন সংস্কৃতি সংসদ ৭ ডিসেম্বর কলকাতা ব্রিগেড ময়দানে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করিয়াছে। সাধুসন্তগণ অনুভব করিয়াছেন, ব্যক্তি জীবন, পরিবার জীবন, সমাজ জীবন, এমনকী রাষ্ট্র জীবনেও গীতাজ্ঞান আলোকবর্তিকার ন্যায় পথপ্রদর্শন করিয়া থাকে। গীতাপাঠের ফলে হিংসা, নিন্দা, অহংকার, বৈষম্য প্রভৃতি যাবতীয় অবগুণ দূর হইয়া, মানুষের উন্নত গুণাবলী বিকশিত করিয়া উন্নত সমাজ তথা দেশ নির্মাণের শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, নানাপ্রকার পাপেরও অবলুপ্তি ঘটিয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'। তাই নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে, গীতাপাঠে ও গীতাজ্ঞান লাভে মানুষের অন্তর শুদ্ধ হইয়া পৃথিবী পাপমুক্ত হইবে।

সুভাষিতম্

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। (গীতা-১৮।৬৬)

অর্থ ঃ সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্য-কর্ম আমাতে অর্পণ করে একমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।

হিন্দুবিরোধীদের বড়ো বিপদ ‘এসআইআর অঙ্কুশ’, তাই হাঁসজারুরা একসুর

ঘোগের বাসা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘এসআইআর’ বা সার নিয়ে বিরোধিতার যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ দিতে পারলে রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর পর খসড়া ভোটার তালিকা বা ‘এসআইআর লিস্ট’ প্রকাশ পিছিয়ে দেবে সুপ্রিম আদালত। এত বড়ো চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে দিশেহারা হাঁসজারু জোট— বাম-কংগ্রেস-তৃণমূল। হাতে আর এক সপ্তাহ সময়। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর কাজ বন্ধ করতে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ওই জোট। আদালতে তাদের করা দাবির সপক্ষে এখনও পর্যন্ত জুতসই কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি ইন্ডিজোট। বিহারে ব্যর্থ হয় সার-বিরোধী কংগ্রেস-আরজেডি জোট। নির্লজ্জরা চুনকালি মাখতে লজ্জা পায় না। কংগ্রেস এখন বাজারের ফুটো ব্যাগ। পয়সা বা আনাজ রাখলে তা পড়ে যেতে বাধ্য। কংগ্রেসের দুই সর্বোচ্চ নেতা-নেত্রী— রাহুল গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রায় ৯৮৮ কোটি টাকার সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। ফৌজদারি অভিযোগ জমা পড়েছে। বামেদের তালা পড়ে যাওয়া ‘পালিত ব্যুরো’ও জানিয়েছে অবিলম্বে এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বন্ধ করতে হবে। কংগ্রেস ও তৃণমূল আগেই সে পথ নিয়েছে। এ রাজ্যে সার-বিরোধীদের একটাই লক্ষ্য। সেটা হলো— বেআইনি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভোট রক্ষা করা। জল ভোটে জিতেই এই ত্রয়ী বিভিন্ন সময় রাজ্য শাসন করেছে। নিরুপায় হয়ে এখন মিথ্যা আওয়াজ তুলেছে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের দল নয়। বিজেপি ‘বহিরাগত’ বলে তাদের দাবি। মুসলমান ভোট সরে যাওয়ায় ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামেরা ধ্বংস হয়ে যায়। সার-বিরোধিতা তাকে আরও গাঢ় করে তুলেছে।

‘এসআইআর’ হলো পরীক্ষিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। তাহলে বিরোধিতা কেন? বিজেপির রাজনৈতিক প্রসারকে রুখতে গিয়ে বিরোধীরা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তাই সমস্ত ধরনের প্রশাসনিক বিরোধিতায় মত্ত হয়ে উঠেছে। ছাড় পাচ্ছে না সাংবিধানিক সংস্থার কাজকর্মও। সার-বিরোধিতায় বিহারে প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার পদযাত্রা করেছিলেন রাহুল গান্ধী। তারপর অন্তর্ধান করেন। এই যাত্রায় বিহারের ৩১টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র একটি (আরারিয়া) জেতে কংগ্রেস। রাজনৈতিকভাবে ফুরিয়ে যাওয়া বামেরা ‘বাংলা বাঁচাও’-এর জন্য উত্তরবঙ্গে যাত্রাপালা করেছে। সারা দেশে ন’টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৫১ কোটি ভোটার সংবলিত ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলেছে। এসআইআর-কে সামনে রেখে বিরোধীদের টার্গেট যে বিজেপি তা সকলেই জানেন। সকাল থেকেই তাই ভ্যান গাড়ি নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ও জেলায় টিম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সার-বিরোধিতায় নেমেছে। তাতে ভারতীয় জনতা পার্টির নবতিপর, প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণীকে নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক প্রচার চলছে।

একথা না বললে ইতিহাসের অপলাপ হবে যে, স্বাধীনতার আগে ও পরে ভারতের বহু নেতা ও তথাকথিত সমাজ সংস্কারক যতটা না ব্রিটিশ-বিরোধী ছিলেন, তার চাইতে বেশি হিন্দু আচার-বিচার বিরোধী ছিলেন। কেবলমাত্র হিন্দুবিরোধিতা করার জন্য এইসব স্বঘোষিত সংস্কারকরা আরবি, ফার্সি, উর্দু ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছেন। দেশের মানুষের ভালো করতে গিয়ে অনেক সময়ই ব্রিটিশ সাহেবদের গোলামি ছাড়ার কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন। ফলে ‘বন্দে মাতরম্’-এর মতো জাতীয় মন্ত্রেও কোপ পড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে অকারণ মুসলমান তোষণ তার উদাহরণ। খারাপ জিনিস প্রভাবশালী হয়ে উঠলে তাকে হটাতে ‘অঙ্কুশ’-এর প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বর্তমান অঙ্কুশ হলো ‘এসআইআর’। এই প্রক্রিয়ায় হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ হয় না। কারা বেআইনি ভোটার তা ধরে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সঠিক দাবি করেছেন যে, ইংরেজি ভাষা তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি বাড়তি মোহ জাতীয় ভাবনাকে পিছিয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইংরেজি ভাষাবিরোধী নন। তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-সংক্রান্ত চিন্তাধারার কথা বলেছেন। ‘কলোনিয়াল হ্যাংওভার’-মুক্ত দেশ গঠনের ওপর জোর দিয়েছেন। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাবনাকে অনেক সময় ভারতে ইংরেজি ভাষাচর্চাকারীরা ‘ইংরেজি ভাষা-বিরোধী’ হিসেবে তুলে ধরেছে। ইউরোপীয় দেশগুলির মতো ভারত কোনো নেশন-স্টেট নয়। ভারতবর্ষ হলো সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র, কেবল কতিপয় জাতি অধ্যুষিত ভূমিখণ্ড নয়। যেমন, রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্য-সহ অষ্টাদশ পুরাণকে ‘পৌরাণিক ইতিহাস’ বলা হয়ে থাকে। এই ধারণা ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। ‘রাষ্ট্র’ হলো সংস্কৃতিবাচক শব্দ। ‘হিন্দু’ হলো জাতিবাচক শব্দ। দেশবাসী যখন ভারত জননীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে, তখন মাতৃভূমির সঙ্গে তাঁদের যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সম্পর্ক হলো ‘রাষ্ট্রীয়তা’র সম্পর্ক। আবহমানকাল ধরে যে সকল ভারতবাসীর মধ্যে এই সংস্কৃতির শিকড় প্রোথিত রয়েছে, তাঁরাই সম্মিলিতভাবে ‘হিন্দু’ জাতি। যে সকল ভারতবাসীর মধ্যে এই সাংস্কৃতিক ধারা প্রবহমান এবং ভারত যাঁদের জন্মভূমি, কর্মভূমি, তাঁরা হলেন হিন্দু জাতিভুক্ত ও ভারতীয়। সনাতন ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্যান্যদের উপাসনা পদ্ধতি ভিন্ন হলেও সংস্কৃতিগতভাবে সকলেই ‘এক জাতি, এক প্রাণ’। ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব হলো ‘হিন্দুত্ব’। বিশ্লেষকরা দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে ‘এসআইআর’ কেন প্রয়োজন ছিল। বিষয়টা অনেকটা বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার মতো। পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশার তিন কারিগরের ঘরে ঘোগের বাসা বেঁধেছে ‘সার’। ফলে তিনজনেই একসঙ্গে ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে বলছে কোনো ‘বৈধ’ ভোটার যেন এই প্রক্রিয়ায় বাদ না যায়। তারা বুঝে গিয়েছে যে, ভুতুড়ে ভোটার তাড়াতে ‘সার’ ওঝা এসেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সেসব ভুতের অস্তিত্ব জানা যাবে। ২০২৬-এর ভোট বাক্সে তার প্রভাব কতটা পড়বে, এখন সেটাই দেখার।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

গরম গরম রুটি

ছুটিশ্রী দিদি,

বামেরা ৩৪ বছরে বাঙ্গালির যে ক্ষতিটা করতে পারেনি, তৃণমূল সরকার সেটা মাত্র ১৪ বছরেই করে দিয়েছে। মানুষকে কর্মবিমুখ করে দিয়েছে। এটা সবাই বলছে দিদি। আমি কিন্তু নয়। 'আজ আমাদের ছুটি, গরম গরম রুটি'— আমি ছেলেবেলা থেকেই ছড়াটা ভালোবাসি। তবে এখন ছুটি ছুটি ছুটি এত বেড়ে গিয়েছে, যে, ছোটোদের কাছে ছুটি এখন আর কোনো আলাদা মানে রাখে না। ২০১১ সালে রাজ্যে মোট ছুটি ছিল, সাকুল্যে ২১টি। এখন এর তিন গুণ। আসলে আপনি দিদি, ক্ষমতায় এসেই বুঝছিলেন, বাঙ্গালিকে কাজ করতে বলা যাবে না। সরকারি কর্মীদের ডিএ না দিলে আন্দোলন করবে কিন্তু ছুটির নেশা ধরিয়ে দিলে সবটা থিতিয়ে যাবে। সেটাই হয়েছে। এখন ডিএ-র দাবি নিয়ে এত মাতামাতি হলেও দেখবেন এত ছুটি কেন তা নিয়ে সরকারি কর্মী থেকে স্কুল, কলেজের শিক্ষকেরা কখনো প্রশ্ন তোলেন না। তাঁরা মনে করেন ছুটি আমাদের অধিকার। আর কাজ করাটা সরকারকে বোনাস দেওয়া।

আসি যাই মাইনে পাই কিন্তু বেসরকারি ক্ষেত্রে নেই। ফলে সমাজে একটা শ্রেণীবৈষম্যও তৈরি হয়েছে গত দেড় দশকে। হাড়ভাঙা খাটুনির বেসরকারি চাকুরেরা ঈর্ষার সঙ্গে ঘৃণাও করেন 'আমি সরকারি কর্মচারী' গান গাওয়া অলসদের। কেউ কেউ এটাও বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিএলও-রা কাজের চাপ নিতে পারছেন না সেটাও আসলে কাজ না করে করে, ছুটির পর ছুটি কাটিয়ে একটুতে হাঁপিয়ে যান সরকারি কর্মীরা। কমিশন এসআইআর-এর কাজ বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মীদের দিয়ে করালে এটা গ্যারান্টি যে, কোনো আত্মহত্যা, কোনো অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ছাড়াই এসআইআর আরও কম সময়ে হয়ে যেত।

দিদি, ছুটিদাত্রী হিসেবে আপনি কেমন ম্যাজিক জানেন তার অনেক নজির আছে। ২০২৬ সালের তালিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য রয়েছে ২৭টি ছুটি। আর রাজ্য সরকার দিচ্ছে আরও ২৪টি ছুটি। মানে, ৫১টি। এর পরেও পুষিয়ে দেওয়া ছুটি রয়েছে। স্কুল-কলেজের জন্য গরমের ছুটি। সেটা আবার কারণে-অকারণে বেড়ে যায়। এবারই তো পূজার আগে কলকাতায় বৃষ্টির জল জমেছে বলে গোটা রাজ্যে পূজার ছুটি তিন দিন এগিয়ে এসেছিল। আবার রাঢ়বঙ্গে বেশি গরমের জন্য উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র গরম ছাড়াই গরমের অতিরিক্ত ছুটি। এর পরে ৫২ + ৫২ মোট ১০৪টি শনি ও রবিবার। এটা সবাই পায় না। অনেকেই অর্ধেক পান। তাই কমিয়ে ধরলেও বছরে কমপক্ষে ছুটি ১২৫ দিন ছুটি। মানে বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ছুটির দিন। আচ্ছা বলুন তো, কোনো রাজ্যে সরকারি কর্মীরা এত ছুটি কাটালে কাজটা কবে হবে! উন্নয়ন কী করে হবে! শিল্পপতিরা ছুটির বঙ্গে কেন আসবেন! রাজ্যের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি কী করে হবে! এই রে, ভুল করে অনেকগুলো ভুল প্রশ্ন করে ফেলেছি! সরি দিদি সরি।

২০২৬ সালে সরস্বতী পূজার আগের দিনও প্রতিমা কেনার ছুটি। দোলযাত্রার পরের দিন রং তোলার ছুটি। ইদ-উল-ফিতরের আগের দিনও ছুটি। সঙ্গেই রয়েছে শনি ও রবি। ইদুজ্জোহার আগের দিন, কালীপূজাতেও চার দিনের টানা ছুটি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরের দিন খাওয়া দাওয়া হজম করার ছুটি। ছটপূজাতেও জোড়া ছুটি। তাও তো নেতাজীজয়ন্তী এবং সরস্বতী পূজা আগামী বছর একই দিনে পড়েছে। বুদ্ধপূর্ণিমা এবং মে দিবস একই দিনে পড়েছে। ছুটির মালা পরিয়ে দিয়েছেন দিদিভাই আপনি। তাই তো বারংবার তাঁকেই জেতাতে চাই। পশ্চিমবঙ্গ তো এমন মেয়েকেই চায়।

ছুটি দিলে সরকারের আর্থিক লাভও রয়েছে। ইলেকট্রিক বিল কম হয়। দ্বিতীয় লাভটি আসে মিড-ডে মিল থেকে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় এক কোটি ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে দুপুরের খাবার খায়। এর জন্য খরচের ৬০ শতাংশ আসে কেন্দ্র থেকে এবং বাকি অংশ রাজ্যের। দীর্ঘদিন ছুটি থাকার ফলে বিপুল ব্যয়ভার থেকে খানিকটা অব্যাহতি পাওয়াও বটে। কিন্তু সরকারের লাভের চক্করে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব ও নিম্ন- মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা। পুষ্টিকর খাবার থেকেই শুধু তারা বঞ্চিত হয় না, যারা মূলত পড়াশোনার জন্য স্কুলের উপরেই নির্ভর করে এবং যাদের গৃহশিক্ষকের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা নেই তারা পিছিয়ে পড়ে। এই রে, আবার ভুলভাল লিখে ফেলেছি। না, দিদি আমি বিদায় নিচ্ছি। □

বেআইনি অনুপ্রবেশের সব দায় কি রাজ্যের শাসক দলের নয়?

বিশ্বপ্রিয় দাস

এ কেমন দ্বিচারিতা, একদিকে যিনি গোটা দলকে নামিয়ে দিয়েছেন এসআইআর সফল করতে, অন্যদিকে তিনি মানুষকে আতঙ্কিত করছেন, সংশয়ের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করছেন। এ কেমন রাজনৈতিক চরিত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর! তিনি গত ২৪ নভেম্বর মতুয়াদের কাছে গিয়েও একই ভাবে উসকানিমূলক কথা, সংশয় তৈরি করার কথা বলতে দ্বিধা বোধ করেননি। সেই সংশয়ের তাস তিনি অবলীলায় খেলে যাচ্ছেন বারে বারে।

এতো গেল সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে ভুল বোঝানো, অন্যদিকে যে সব সরকারি কর্মচারী, যারা বিএলও হিসেবে কাজ করছেন, তাঁদের ভয় দেখানোর খেলাটাও চালিয়ে যাচ্ছেন সেই শুরু থেকেই। যেদিন ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচি (এসআইআর) চালু হয়েছিল সেদিন থেকেই সবার নাগরিকত্ব গেল গেল রব তুলেছেন রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো থেকে একেবারে সেকেন্ড ইন কম্যান্ড সমেত সারা রাজ্যের তৃণমূল নেতারা। তা সত্ত্বেও যারা বিএলও হয়ে কাজ করছেন, তাঁরা এই এসআইআর সফল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই এসআইআর চলছে। বিহারে সফল হয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মতো বেআইনি অনুপ্রবেশের সমস্যা নেই। তাই হয়তো এই রাজ্যের মতো ভোটের ময়দানে দাগ ফেলে না।

এ রাজ্যের শাসক দল আর এক নতুন খেলা শুরু করেছে, অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য সব দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে পালানোর পথ খুঁজছে। দেশভাগের সময় তাঁরা যাঁরা অত্যাচারিত হয়ে নিজের ভিটে মাটি ছেড়ে এই ভারতে চলে এসেছিলেন একটু ঠাঁই পাবার আশায়, তাঁদের মনে এত বছর বাদে নাগরিকত্ব হারানোর ভয় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একবারের জন্যও তিনি রাজ্যের অভিভাবক হয়ে এই সব ভিটে হারাদের মনে নিশ্চয়তা দেওয়া দূরে থাক, উলটে আবার সেই ভিটে হারানোর ভয় দেখাতে শুরু করেছেন।

এসআইআর নিয়ে বিএলও-দের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির কারিগর রাজ্যের শাসক দল মনে আতঙ্ক ও ভয়ের কারণ তৈরি করেছে। একটু নরম মনের বিএলও'রা এই পরিবেশকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছেন না। এই প্রতিবেদক বহু বিএলও'র সঙ্গে কথা বলেছে, তাঁরা এই কাজটাকে সম্মানের সঙ্গে করছেন। তাঁরা বলছেন এটা নাগরিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ছে। একটু চাপ আছে। আর রাজনৈতিক ভাবে চাপ বাড়িয়েছে শাসক দল। তাঁরা প্রতিনিয়ত সঙ্গে থেকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করে চলেছে। এমনকী বিএলও-দের ফর্ম বিলির সময় বাড়ি বাড়ি যেতে বাধা দেওয়ার থেকে বেশি সহায়তার নামে, তাঁদের ক্যাম্পে বসিয়ে ফর্ম বিলি করতে বাধ্য করছে। তাঁরা আরও বলছেন, বহু বিএলও আছেন যারা শাসক দলের সমর্থক। তাঁরা এটা মেনে নিলেও, অনেকেই মানতে চাইছেন না। তাঁরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ও যে ট্রেনিং পেয়েছেন, সেটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন। আর তাতে কাজে গতি আসছে। তাঁরা এও বলছেন যে শাসক দলের যে সব মানুষ তাঁদের সঙ্গে ঘুরছেন, তাঁরাও যাতে এই কাজটিকে একজন সাধারণ আইসিডিএস কর্মী থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষকরা সময়মতো না করতে পারেন, সেই দিকেও ঠেলে দিতে পিছপা হচ্ছেন না।

এছাড়াও বহু বিএলও আছেন, যারা ডিজিটালাইজেশনের কাজ করার ব্যাপারে পটু নন। তাঁরাও চেষ্টা করছেন কারোর সাহায্য নিয়ে কাজটাকে সফল করতে, সেখানেও বাধা আসছে শাসকদলের নেতাদের কাছে থেকে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু এলাকার শাসক দলের কর্মীদের ভয় দেখানোর খবর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এমনকী বেশ কিছু কর্মী আটক হয়েছেন এই কাজ করার জন্য। সেই ভয় অনেক বিএলও কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। কেননা, তাঁরা বলছেন জলে নেমে কুমিরের মুখে রয়েছেন তাঁরা। সামান্য কিছু হলেই এই শাসক দলের খপ্পর থেকে কীভাবে বাঁচবেন, তাঁরা জানেন না। তাঁদের প্রতিনিয়ত একথা কথা বলা হচ্ছে যে একটাও নাম যেন বাদ না যায়। যদি বাদ যায়, তাহলে দেখে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। ফলে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়ে নিজেকে শেষ করে দিতে পিছপা হচ্ছেন না কেউ কেউ। কয়েকজন বিএলও অসুস্থও হয়েছেন।

সারা রাজ্যে আনুমানিক ৮০ হাজার ৬৮১ জন বিএলও নিযুক্ত রয়েছেন এই কাজে। তাঁরা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৪ হাজার ভোটারের মধ্যে নিবিড় সংশোধনের কাজ করছেন। সেখানে রয়েছে মৃত ভোটার, যারা ২০০২ সালের ভোটার লিস্টেও আছেন, আবার ২০০২ সাল থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে অনেকেই চলে গিয়েছেন অন্যত্র— তাঁরাও রয়েছেন। অন্যদিকে বহু এমন ভোটার আছেন, যাঁদের নাম একাধিক জায়গায় রয়েছে, এমনও আছেন, যারা বেআইনি ভাবে এই রাজ্যে

এসেছেন, এসে খুব সহজে আধার ও ভোটার কার্ড বানিয়ে নিয়েছেন। আর সেটার কারণেই এখানকার ভোটার হয়ে গেছেন। একটি দেশের পক্ষে এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা হচ্ছে একটি প্রধান সমস্যা। দেশের আর্থিক পরিকল্পনা থেকে কর্মসংস্থানের ওপর নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে এই বেআইনি অনুপ্রবেশ। এই এসআইআর-এর মধ্যে দিয়ে সামান্য হলেও চিহ্নিত করা যাবে এদের। চিহ্নিত করা গেলে, তাদের দেশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঠেকানো যাবে। একসময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই অনুপ্রবেশ নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। সেই আন্দোলনে তাজা প্রাণের বলিও দিয়েছেন বেশ কয়েকজন তরুণ। দিনটা এখনও পালিত হয় সেই বলিদানের দিন হিসেবে।

গত ২৪ নভেম্বর মতুয়াদের সভায় গিয়ে এই এসআইআর নিয়ে বলতে গিয়ে নাগরিকত্ব হারানোর প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের মনে ভয়ের রাজনীতি আমদানি করেছেন। পরোক্ষে চাপ দিয়েছেন এসআইআর নিয়ে কাজ করতে থাকা বিএলও কর্মীদের। যদিও দেখা গেছে সিংহভাগ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছেন বিএলও কর্মীরা। শাবাশ জানাতে হয় তাঁদের। আর যারা কাজের চাপে, শাসক দলের মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, আত্মহননের মতো পথ বেছে নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য সমবেদনা জানাবার ভাষা হয়তো এই প্রতিবেদকের জানা নেই। এর জন্য দায়ী কে? কাজ করতে থাকা বিএলও'রা জানাচ্ছেন, চাপ সব কাজেই থাকে। তাঁরা যদি কোনো কর্পোরেট সংস্থায় কাজ করতেন, সেখানে কি চাপ থাকত না? ফলে এই চাপের কথা আসবেই, সেটা সাময়িক। মাত্র দেড় মাস। অন্যদিকে এই কাজ শেষ হবার পর কী পরিস্থিতি হতে পারে, সেটাও তাঁদের ভাবাচ্ছে। কতটা তাঁরা রোষানলে পড়বেন রাজ্যের শাসক দলের, সেটাও ভাবাচ্ছে বিএলওদের।

এদিকে এসআইআর-এর কাজের বিষয়টিকে স্থগিত ও বিলম্বিত করার জন্য নানা পন্থা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেটাও তাদের লাভের জায়গায় না যাওয়াতে, শেষে মরিয়া হয়ে তিনি বিএলওদের দিয়ে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে হানা দিয়েছেন। যদিও বিএলওদের আন্দোলন বলে সূচিত কর্মসূচি, সেখানে সামান্য কয়েকজন তৃণমূল সমর্থক বিএলও-কে দেখা গিয়েছে। বাকি সব কোনো না কোনো শাসক সংগঠনের নেতা বা সদস্য।

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় অনুপ্রবেশের সমস্যা চিরকালীন। রাজ্যের শাসক দল একটা অদ্ভুত প্রশ্ন তুলেছে। উত্তরপ্রদেশে তো অনুপ্রবেশ নেই, সেখানে কেন এসআইআর। ত্রিপুরা বা অসমে হতে পারে, আমাদের রাজ্যেও হচ্ছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের এই অনুপ্রবেশ নিয়ে নাকি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছে কেন্দ্রের শাসক দল। তাঁদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে এই রাজ্যের শাসক দল। একটু লক্ষ্য করলেই সচেতন মানুষ দেখতে পাবেন যে ওই সব রাজ্যে বহু দিন ধরেই এই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠেছে। তাঁরা কেউ জামাই আদর করে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেয়নি ভোটব্যাংক বাড়ানোর জন্য। সেখানে খুল্লাম খুল্লা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সরকারি দালালিতে পাওয়া যায় না। এই রাজ্যে সরকারি দলের দালালরা যে এই সব কার্ড অর্থের বিনিময়ে বানিয়ে দিচ্ছে, সেটাও প্রমাণিত। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সেটি দেখানো হয়েছে। তাহলে এই বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বৈধ করে তোলার যে উদ্যোগ এই রাজ্যের তৃণমূলের সরকার ক্রমাগত নিয়েছে, সেই দায় অন্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার কৌশল কেন?

প্রশ্ন হলো, এই রাজ্যে কেন এখনো বহু সীমান্ত এলাকা অরক্ষিত? কেন সেই সব এলাকায় বিকেলের পর সীমান্তরক্ষী বাহিনী থাকার মতো পরিস্থিতি নেই? কেন সেইসব এলাকাগুলি এখনো আলোকিত করার বিষয়ে রাজ্য স্তরে সাহায্য করা হয়নি? কেন গড়ে তোলা যায়নি কাঁটাতারের বেড়া? কেনই-বা অরক্ষিত সীমানা দিয়ে বেআইনি ভাবে দালাল মারফত বহু পয়সা ব্যয় করে অনুপ্রবেশকারীরা (সন্ত্রাসবাদীরাও আছে এর মধ্যে), এদেশে এসে জনসাধারণের মধ্যে মিশে যাচ্ছে, তাঁদের কেন চিহ্নিত করতে পারছে না প্রশাসন? এ দায় তো স্থানীয় প্রশাসনের। তাহলে সেই দায় থেকে নিস্তার পাওয়ার রাস্তা কেন খুঁজতে হচ্ছে? কেনই-বা এই সব বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বৈধ করে তোলার চালু করা প্রক্রিয়াকে বন্ধ করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি? একথা কী রাজ্য প্রশাসন এড়িয়ে চলতে পারে?

সাধারণ মানুষের মনে, দুর্বল চিত্ত বিএলও-দের মনে যে ভয় ক্রমাগত রাজ্যের শাসক দল তৈরি করে চলছে, সেই অপরাধের দিক নির্দেশ কি তাঁদের দিকে করাটা অন্যায়? এটাই এখন সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁরা বলছেন, আমরা এই এসআইআর-কে সর্বতো ভাবে সফল করতে চাই। তাঁর প্রমাণও দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। তাঁরা বলছেন এসআইআর মানে ভোটার তালিকা সংশোধন। তাতে ভয় কীসের? বরং এটার মাধ্যমে নিজেকে ভারতবাসী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার যে প্রচেষ্টা, তাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করাটাই উচিত। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় এসআইআর সফলের পথে। আর এই রাজ্যের মানুষ চাইছেন, সীমান্তে বেড়া দেওয়া হোক, হটিয়ে দেওয়া হোক, বের করে দেওয়া হোক সমস্ত বেআইনি অনুপ্রবেশকারীকে। তাহলে আমাদের রাজ্যের উপকার হবে, ভূমিপুত্রদের কাজের সুযোগ বাড়বে, সুযোগ অনেকটাই বাড়বে উন্নয়নের। সব শেষে একটা কথা বলতেই হয় এসআইআর কিন্তু গণতন্ত্রে জনদেবতাকে সম্মান জানানোর একটা প্রচেষ্টা। সেটা অবশ্যই বৈধ ভারতবাসীদের জন্য। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য নয়। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

গীতা জননীর শরণাপন্ন হলে বঙ্গভূমির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী

উপনিষদ (শ্রুতি প্রস্থান), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (স্মৃতি প্রস্থান) ও ব্রহ্মসূত্র (সূত্র প্রস্থান)-কে 'প্রস্থান ত্রয়ী' বলা হয়। বেদান্ত দর্শন বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থত্রয়কে 'মূল' বা 'চূড়ান্ত' উৎস বা 'প্রস্থান' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পরম্পরাগত বিভিন্ন দিক বা নানাবিধ স্তর বিষয়ক জ্ঞান আহরণের জন্য উপস্থাপিত হয় এই প্রস্থান ত্রয়ীতে উল্লেখিত বাণী এবং তার ব্যাখ্যা। এই সংসার-রূপ সমুদ্র এবং জন্মজন্মান্তরের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, যন্ত্রণা, গ্লানি থেকে মুক্তিলাভ করে পরমাত্মা শ্রীভগবানের সঙ্গে মহামিলনের পথ প্রদর্শন করে এই তিন শাস্ত্র। এই শাস্ত্র পাঠ, তার ব্যাখ্যা শ্রবণ ও অধ্যয়নের মাধ্যমে 'আত্মজ্ঞান'-এর সন্ধান পায় সাধারণ মানুষ। অবহিত হয় ভারতবর্ষের চির পুরাতন অথচ নিত্য নূতন দার্শনিকতার সম্পর্কে। ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতামত অনুযায়ী মৌর্য, গুপ্ত এবং পাল-সেন যুগে বৈদিক পরম্পরার প্রভাব ছিল অধিক। এমতাবস্থায় বঙ্গভূমিতে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' -কে আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে আশ্রয় করে তাঁর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের পূর্বক্ষেত্রে সংঘটিত হয়— 'ভক্তি আন্দোলন'। সেই আন্দোলনের ধারায় ইসলামি শাসনের ভয়াবহতার বিপ্রতীপে জীবনীশক্তির সন্ধান পায় ভারতীয় সমাজ। দেশের বুকে রক্ষা পায় সনাতন ধর্ম। পরবর্তীকালে বেদান্ত দর্শনকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্রাহ্মসমাজ'। নবজাগরণের ভোরে সমগ্র ভারতকে জাগ্রত করে সেই বঙ্গভূমি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ প্রমুখ মহাপুরুষরা অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের প্রচার-প্রসারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের আবির্ভাব কাল থেকে শুরু করে তাঁদের অধ্যাত্ম জীবন কালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জন্মগ্রহণ করে 'আপোশহীন' প্রতিরোধের একটি ধারা। সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ধারায় অংশগ্রহণ করেন ভারত জননীর অসংখ্য দামাল সন্তান। এই বরেণ্য বিপ্লবীদের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। এই ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থ হতেই তাঁরা পেয়েছিলেন ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে আগ্নেয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রেরণা।

আমেরিকা-সহ সারা বিশ্বে এই গীতা-সহ বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রাদি যাঁরা তুলে ধরেছেন, তাঁরাও হলেন দু'জন বাঙ্গালি। তাঁরা হলেন— পরমহংস যোগানন্দ ও অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী পরম্পরার সাধক ও ক্রিয়াযোগী হলেন যোগানন্দজী মহারাজ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরম্পরার সাধক ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের শিষ্য হলেন শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর। তিনি ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য। কিন্তু চল্লিশের দশক থেকে বঙ্গীয় সমাজে ছাপ ফেলতে থাকে মার্ক্সবাদ। এই কারণে বেদ-উপনিষদের জ্ঞান থেকে দূরে সরে যেতে থাকে বাঙ্গালি সমাজ। এই সমস্যাকে তীব্র করে তোলে 'দেশভাগ'। দেশ বিভাজনের দরুন সমগ্র পূর্ববঙ্গকে হারিয়ে ফেলে বাঙ্গালি। সত্তর ও আশির দশকে মোটামুটি বেদ-উপনিষদ-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে ত্যাগ করা শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ। এর বিপ্রতীপে দূরদর্শনে সম্প্রচারিত রামায়ণ ও মহাভারত ধারাবাহিকের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ দেখে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, বাঙ্গালির জিন বা ডিএনএ থেকে বৈদিক সংস্কৃতিকে দূর করা অসম্ভব।

কিন্তু কেমন ছিল বাঙ্গালির শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প-অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য যখন বঙ্গীয় সমাজে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞান ছড়িয়ে দেন শ্রীমহাপ্রভু? আর কেমনই বা কেটেছে বাঙ্গালির জীবন যখন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও সেকুলার শাসককুল বেদ-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে ত্যাগ করে ধর্মহীন, নীতিহীন, ঈশ্বরহীন সমাজ তৈরির স্বপ্ন দেখেন? পর্যালোচনা করা যাক বাঙ্গালির ইতিহাস, যা মুছে দেওয়ার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে বামপন্থী ঐতিহাসিকরা।

ইউরোপের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, ডাচ সাম্রাজ্যকে আর্থিকভাবে স্পন্সর করে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যা ওই দেশের প্রথম পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। কিন্তু কোথায় ইউরোপ এবং কোথায় ইস্ট ইন্ডিয়া (অর্থাৎ পূর্ব ভারত)! বাণিজ্যের জন্য কেন তারা চুঁচুড়ায় এলো? এরপর যদি ফ্রান্স বা ব্রিটেনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, তো দেখা যাবে যে ফরাসি বা ব্রিটিশ— সবাই ব্যবসা করতে এসেছে বঙ্গভূমিতেই এবং এই ব্যবসা থেকেই গড়ে তুলেছে তাদের বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় শুধু দক্ষিণবঙ্গে ১০০ জনের বেশি বড়ো মাপের পণ্ডিত ছিলেন, যাঁদের কাছে ধর্ম, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, সংস্কৃত, বেদ-উপনিষদ অধ্যয়ন করতে আসত এশিয়ার বহু দেশের ছাত্ররা। ১৮৩৫-৩৮-এ বঙ্গপ্রদেশে টোল-চতুষ্পাঠীর সংখ্যা বেড়ে হয় এক লক্ষ। উনবিংশ শতকে ভারতের শাসন পুরোপুরি ব্রিটিশের কব্জায় আসার পর বিজ্ঞান চর্চায় বাঙ্গালি বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দেন। অনেকেই একে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার গুণ বলে দাবি করলেও, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে ঔপনিবেশিক, ইউরোপীয় শাসন বলবৎ হলেও সেখানে কেন এত বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিক, দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটলো না? কেন সেখানে আবির্ভাব ঘটেনি রানি রাসমণির মতো সামাজিক পথপ্রদর্শকের? ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান, অর্থনীতি— সব ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান হয়ে ওঠে 'কলকাতা'। ঐতিহাসিকভাবে তার কারণ ছিল এই বৌদ্ধিক জগতের প্রকাশ ও বিকাশ। সারা দেশ যখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অপব্যাখ্যাকে পাথেয় করে অহিংসার পথ ধরে, তখন বঙ্গজননীর দুই বীর সন্তান গীতার ভাবার্থ ('ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ')-কে মূলমন্ত্র করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁরা হলেন— বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

দেরীতে হলেও পশ্চিমবঙ্গ আবার জাগছে। মানুষ বৈদিক শাস্ত্র শিক্ষার দিকে পুনরায় জোর দিচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা— ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণের জন্য লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষ জড়ো হচ্ছে। আগামীদিনে সারা পৃথিবীর মানুষ শিক্ষাগ্রহণ ও অর্থোপার্জনের জন্য নিশ্চিতভাবে ছুটে আসবে এই পশ্চিমবঙ্গে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে ত্যাগ করার কারণে দেশভাগের সম্মুখীন হয়েছে বঙ্গভূমি। ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে ত্যাগ করার কারণে লক্ষ্মীছাড়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। গীতা জননীর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করলে বঙ্গভূমির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। □

বিহার নির্বাচনে বাম-মাওবাদী দলগুলিকে প্রস্থানের দরজা দেখিয়ে দিয়েছে জনতা

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

২০২০ সালের বিহার নির্বাচনে বাম দলগুলির ফলাফল যা হয়েছিল তা তাদের নিজেদের কাছে হয়তো ছিল অপ্রত্যাশিতরকম ভালো। সিপিআইএমএল লিবারেশন পেয়েছিল ১২টি আসন এবং সিপিএম ও সিপিআই ২টি করে। এমন ফলাফলের পরপরই সিপিআইএমএল লিবারেশনের মতো একখানি অতিবাম মাওবাদী দলের সেক্রেটারি দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য পশ্চিমবঙ্গে কার্যত হয়ে বসেন সিপিএম-সহ সমস্ত বাম দলগুলির উপদেষ্টা বিশেষ। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ২০১১ সালে ক্ষমতা দখলের আগে থেকেই যে সকল মাওবাদী দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, ২০২০-তে বিহার বিধানসভার ফলাফলের পর সেই প্রকার একখানি মাওবাদী দলের সেক্রেটারিই ২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যেকার সমস্ত প্রকার অনৈক্যের চূড়ান্ত অবসান ঘটান। সম্ভবত দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্যেরই পরিকল্পনা রাজ্যের সমস্ত বাম ও অতিবাম দলগুলি রাজ্যের র‍্যাডিকাল ইসলামি দলগুলির (জামাত-এ-ইসলামি, জমিয়তে উলেমা) সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৈরি করে সামগ্রিক একটি বামৈস্লামিক জোট যে জোট মমতা ব্যানার্জির পাশে সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় ২০২১-এর বিধানসভা মহাশক্তিশালী বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের নিশ্চিত পরাজয় ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই জোটবদ্ধ বামৈস্লামিক শক্তি একত্রিত হয়ে 'নো ভোট টু বিজেপি' নামক একটি বিজেপি বিরোধী ক্যাম্পেইন চালায় যে ক্যাম্পেইন ডিজাইনের কৃতিত্ব দেওয়া হয় সামিরুল ইসলাম নামক এক ব্যক্তিকে। নানা প্রতিবাদ আন্দোলন সংক্রান্ত মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী এই ব্যক্তি দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্যের বিশেষ প্রিয়পাত্র। নির্বাচনের পর এই সামিরুল ইসলামকেই আবার তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যসভায় পাঠায় তাদের সাংসদ হিসেবে, তার 'নো ভোট টু বিজেপি' ক্যাম্পেইনের পুরস্কারস্বরূপ।

২০২১-এ তৃণমূলের পরাজয় ঠেকাতে রাজ্যের ইলেকশন কমিশন ও প্রশাসনিক মেশিনারিকেও করতে হয় নানাপ্রকার ন্যাক্কারজনক কারচুপি এবং শেষপর্যন্ত ভোটের ফলাফল-পরবর্তী সময়ে রাজ্য জুড়ে শুরু হয় বিধ্বংসী প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ যার মাধ্যমে মানুষের ধর্মীয় পরিচয় এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে বেছে বেছে আক্রমণ শাণানো হয় হিন্দু সমাজের মানুষ ও বিজেপি পার্টির ভোটার ও কার্যকর্তাদের উপর। এই হিংসার প্রকৃতি স্পষ্টতই ছিল বামৈস্লামিক ধাঁচের এবং ছিল একখানি ধর্ম-রাজনৈতিক গণহত্যা। ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসা এবং রাজ্যে 'খতমের রাজনীতি'ওয়ালা মাওবাদী শক্তিকে উজ্জীবিত করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ পরবর্তী মাওবাদী-জামাত আঁতাত

সেই থেকে আজ পর্যন্ত সেই একই মাওবাদী-জামাত আঁতাত নিয়ন্ত্রণ করছে এ রাজ্যের রাজনীতিকে এবং সিপিআইএমএল লিবারেশনের দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য থেকেছেন আরবান মাওবাদীদের সেই গ্রুপের অন্যতম প্রধান এক সদস্য হয়ে, যে গ্রুপ মমতা ব্যানার্জির মুখকে সামনে রেখে কার্যত শাসন করেছে পশ্চিমবঙ্গকে এবং চালিয়ে গিয়েছে সরকারি তহবিলের অপরিসীম তছরুপ। আরবান মাওবাদীদের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা তৃণমূল দলের সুবিধার্থে আদালতে নানা মামলাও করেছে তথাকথিত নানা অরাজনৈতিক সংগঠন। যথা পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি (পিবিকেএমএস) পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজের অধিকার আদায়ের দাবিটি নিয়ে আদালতে ঠুকেছিল মামলা। দাবিটি সঙ্গত হলেও পাবলিক ডোমেইনে প্রাপ্য তথ্য অনুযায়ী পিবিকেএমএস নামক স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নটি আদতে একটি মাওবাদী সংস্থা বলেই প্রতীত হয়।

> **ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গে সাযুজ্যহীন বিদেশি মতবাদগুলিকে অনুসরণ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে পড়েছে নরকগামী, অসহায়, হতদরিদ্র। মমতা ব্যানার্জির পরাজয়ই সেই গ্রহণ কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে দান করবে নবজীবন।**

বিহার নির্বাচন ২০২৫ : পশ্চিমবঙ্গের জন্য আশার সঞ্চার

এসবের পর বিহার বিধানসভার ২০২৫-এর ফলাফল এমন বাম দলগুলির জন্য অবশ্যই এক অপরিসীম ধাক্কা, যে ধাক্কার আঁচ তাদের উপর এসে পড়ার কথা। তাদের পরম মিত্র হিসেবে এ ধাক্কা লাগার কথা মমতা ব্যানার্জির গায়েও। মমতা ব্যানার্জি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিক হলেও তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি কতখানি তাঁর নিজস্ব আর কতখানি তাঁর সহযোগী বাম-মাও-জামাত জোটের সদস্যদের পরামর্শ-জাত, তার স্পষ্ট আন্দাজ পাওয়া বাইরে থেকে অসম্ভব। বিহার বিধানসভায় ১২ থেকে ২-এ নেমে আসা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্যের দল

ফঃ ২

এবং মমতা ব্যানার্জির পক্ষে চরম হতাশাজনক হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সিপিআইএমএল লিবারেশনের মতো দল আগাগোড়াই থেকেছে মমতা ব্যানার্জির পাশে পাশে। সেকারণেই বিহারের ফল মনোবল ভেঙে দিচ্ছে তৃণমূল-সহ বামদলগুলির সমর্থকদের এবং তারা হয়ে পড়ছে উদ্বিগ্ন ও উৎক্ষিপ্ত। যদিও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন, নেতিবাচক এবং ভারতের অপর কোনো রাজ্যের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তার সাদৃশ্য কিছুমাত্র নেই। তৎসত্ত্বেও বাম ও অতিবামেদের এই হার পশ্চিমবঙ্গের জন্য অবশ্যই এক আশার আলো তা সে যত ক্ষীণই হোক।

সিপিআইএমএল লিবারেশনের নির্বাচনী কৌশলের অন্য উদাহরণ : বিহারে বামেদের আসনওয়াড়ি ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করার আগে সিপিআইএমএল লিবারেশনের আরও কিছু নির্বাচনী কৌশলের উপর দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

ঝাড়খণ্ড ২০২৪ : ২০২৪-এ ঝাড়খণ্ড বিধানসভার নির্বাচনে ক্ষমতাসীন 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা'র প্রতি বহু মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছিল যে বিকর্ষণ, তার ফলে জেএমএম-বিরোধী ভোট যাতে বিজেপির বাক্সে গিয়ে পড়তে না পারে, তার জন্য ২০২৪-এ ঝাড়খণ্ড নির্বাচনের ঠিক আগে সেই বছরেই গঠিত হয় 'ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চা' নামক একটি নতুন দল। এমন দলটি গঠনের পিছনে সিপিআইএমএল লিবারেশনের কৌশলগত পরিকল্পনা থাকা সম্ভব। এনডিএ-বিরোধী মহাগঠবন্ধনের বাইরে থেকে নির্বাচনে লড়ে 'জেএলকেএম' দলটি মাত্র ১টি আসনে জিতলেও ঝাড়খণ্ডে পড়া মোট ভোটের ৬ শতাংশাধিক ভোট টেনে নেয় তাদের নিজেদের বাক্সে। এতদংশ ভোটের তফাতে যে আসন সংখ্যার হেরফের হতে পারে বিশাল সংখ্যায়, বিহার বিধানসভার ২০২৫-এর নির্বাচন তা দেখাচ্ছে স্পষ্ট। যথা, ১৪৩টি আসনে লড়ে ২৩ শতাংশ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবছরের বিহারে পেয়েছে ২৫টি আসন। অন্যদিকে ১০১টি আসনে লড়ে ২০.০৮ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি দলটি পেয়েছে ৯০টি আসন। এই হারে হিসেব করে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রাপ্ত ভোট আরও ৬ শতাংশ বেশি হলে তাদের আসন সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যেতে পারত। অর্থাৎ ৬ শতাংশ ভোটের পার্থক্য আসন সংখ্যার হিসেবে ঘটিয়ে দিতে পারে বিরাট হেরফের। ২০২৪-এর ঝাড়খণ্ডে বিজেপির পরাজয়ের কারণও ছিল সেইটিই। ঝাড়খণ্ডে বিজেপি তাদের ২০১৯-এর ভোট শতাংশ ধরে রাখতে পারলেও 'জেএলকেএম'-এর উপস্থিতির কারণে প্রতিষ্ঠানবিরোধী ভোট পায়নি, ফলে বিজয় নিশ্চিত করতে ভোট শতাংশ ও আসন সংখ্যার যে বৃদ্ধি বিজেপির জন্য আবশ্যক ছিল, তা হয়নি। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্যের মতো অতিবাম স্ট্র্যাটেজিস্টরা মনে করেছিলেন যে এমন নতুন দল খাড়া করার কৌশলের দ্বারা বিজেপির ভোট ভাগ করে বিজেপিকে হারাতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন।

ঝাড়খণ্ডের কৌশল বিহারে ব্যর্থ : ফলত সেই একই পদ্ধতিতে, এবছরের বিহার নির্বাচনেও প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরাজ পার্টি' নির্বাচনে লড়ে 'জেএলকেএম'-এর মতোই মহাগঠবন্ধনের বাইরে থেকে। এই দলেরও উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবেই ছিল এনডিএ-এর ভোট কাটা। এই 'জন সুরাজ পার্টি'কেও সমর্থন জানাতে দেখা যায় সিপিআইএমএল লিবারেশনের দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের কৌশল বিহারে কার্যকরী হয়নি, কারণ দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, প্রশান্ত কিশোরের মতো ভোটকুশলীরা হয়তো সম্যক উপলব্ধি করেননি যে ঝাড়খণ্ডে 'ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চা'র মতো দল আদতে ভাগ করেছিল বিজেপির ভোট নয়, বরং প্রতিষ্ঠানবিরোধী তথা 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা'-বিরোধী ভোট। ফলে বিজেপি তথা এনডিএ এহেন জেএমএম-বিরোধী ভোটগুলি নিজেদের বাক্সে পায়নি বলেই পরাজিত হয়েছিল। অন্যদিকে বিহারের জনগণের সামনেও প্রশান্ত কিশোরের দলের উপস্থিতি মূলত ভাগ করেছে বিহারের এনডিএ-বিরোধী তথা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভোটকেই। যদিও প্রশান্ত কিশোরের দল সর্বমোট দশ লক্ষ ভোটও পায়নি, ২৩৮টি আসনের মধ্যে ২৩৬টি আসনে হারিয়েছে জামানত এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে পেরেছে একটিমাত্র আসনে। তৎসত্ত্বেও বেশ অনেকগুলি আসনেই এনডিএ প্রার্থীর পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরাজ পার্টি'। যথা, চানপতিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী কংগ্রেসের কাছে পরাস্ত হয়েছে মাত্র ৬০২ ভোটে আর 'জন সুরাজ পার্টি' থেকেছে তৃতীয় স্থানে।

বিহারে বাম-মাও ভোটকুশলীদের প্রধান ভুল

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বিহারে এনডিএ-র এমন বিপুল জয়ের আদত কারণ হলো এই যে, বিহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ছিল না বরং ছিল প্রতিষ্ঠান সমর্থনের বাতাবরণ। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, প্রশান্ত কিশোরদের মতো বাম-মাওমনস্ক ভোটকুশলীরা তা অনুভব করতে পারেননি। তাঁরা নিজেরা এনডিএ-বিরোধিতায় আচ্ছন্ন বলেই হয়তো জনমনের আভাস পাননি। উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির বিকট নেতিবাচক এই রূপ বাকি ভারতের এক সুবিশাল অংশকে কী প্রকারে এনডিএ-বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তুলছে, বাম-মাওবাদীদের নেতিবাচক মনস্তত্ত্ব দিয়ে তা অনুভব করা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

বিহার নির্বাচন ২০২৫ : বাম দলগুলির আসনওয়াড়ি ফল

বিহার নির্বাচনে বাম দলগুলির গোহারা পরাজয়ের চিত্রের দিকে তাকানো যাক। সিপিআইএমএল লিবারেশনের কাছে ছিল বলরামপুর, জিরাডেই, দারাউলি, ফুলওয়ারি, পালিগঞ্জ, আগিআঁও, সিক্তা, দুমরাওঁ, কারাকাট, ঘোসি, আরওয়াল ও তারারি আসনগুলি। বলরামপুরে লোকজনশক্তিপার্টি (রামবিলাস) এআইএমআইএম'কে হারিয়েছে ৩৮৯ ভোটে যেখানে সিপিআইএমএল লিবারেশন চলে গিয়েছে তৃতীয় স্থানে। এই আসনটি মূলত মুসলমান ও কিছু পিছড়াবর্গের মানুষের আসন হওয়া সত্ত্বেও এআইএমআইএম এবং সিপিআইএমএল লিবারেশনের মুসলমান পুরুষ প্রার্থীরা এলজেপি'র সঙ্গীতা দেবীর কাছে পরাস্ত হয়েছেন। বিহারের বলরামপুর আসনের এমন ফলাফল সেই অর্থে নারী সশক্তিকরণেরও এক দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। জীরাদেই-এ জেডিইউ সিপিআইএমএল লিবারেশনকে পরাস্ত করেছে ২৬২৬ ভোটে। দারাউলিতে সিপিআইএমএল লিবারেশন এলজেপি'র কাছে পরাস্ত হয়েছে ৯৫৭২ ভোটে আর

ফুলওয়ারীতে জেডিইউ সিপিআইএমএল লিবারেশনকে পরাস্ত করেছে ৩২৬৫৭ ভোটে। আগিআঁও আসনটিতে বিজেপির কাছে সিপিআইএমএল লিবারেশন পরাস্ত হয়েছে মাত্র ৯৫ ভোটে। সিক্তাতে একজন নির্দল প্রার্থী জেডিইউ-এর কাছে পরাজিত হয়েছেন ৪৭১৪৪ ভোটে যেখানে সিপিআইএমএল লিবারেশন চলে গিয়েছে তৃতীয় স্থানে এবং জেডিইউ-এর কাছে পরাজিত হয়েছেন ৪৭১৪৪ ভোটের ব্যবধান। জেডিইউ সিপিআইএমএল লিবারেশনকে দুমরাওঁ আসনে পরাস্ত করেছে ২১০৫ ভোটে আর ঘোসি'তে ১১৯২৯ ভোটে। আরওয়ালে বিজেপি সিপিআইএমএল লিবারেশনকে হারিয়েছে ১৪০৯৩ ভোটে এবং তরারিতে হারিয়েছে ১১৪৬৪ ভোটে। এছাড়াও, এবারের নির্বাচনে আরা আসনে প্রার্থী দিয়েছিল সিপিআইএমএল লিবারেশন, যে প্রার্থী বিজেপির কাছে পরাস্ত হয়েছে ১৯৫৮১ ভোটে। ২০২০-র আসনগুলির মধ্যে কেবলমাত্র পালিগঞ্জ ও কারাকট ধরে রাখতে পেরেছে সিপিআইএমএল লিবারেশন যেখানে পালিগঞ্জে এলজেপি-কে তারা হারিয়েছে ৬৬৫৫ ভোটে এবং কারাকটে জেডিইউ-কে পরাস্ত করেছে ২৮৩৬ ভোটে। অর্থাৎ বিহার নির্বাচনে সিপিআইএমএল লিবারেশনের মাওবাদ যে চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একাধিক আসনে মাওবাদ পরাস্ত হয়েছে সরাসরি বিজেপির কাছে যা প্রমাণ করে যে মাওবাদী ক্ষেত্রগুলিতেও মানুষ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াশীলতার রাজনীতি ছেড়ে ধরতে চেয়েছে বিকাশপন্থী রাজনীতির হাত। ভারতের প্রকৃত বিকাশের জন্য জনমানসের এই পরিবর্তন অপরিহার্য। সিপিএম ও সিপিআই-এর ফলও হয়েছে অনুরূপ খারাপ। বিভূতিপুর আসনটি জেডিইউ-কে ১০২৮১ ভোটে হারিয়ে ধরে রাখতে পারলেও মানঝি আসনে জেডিইউ-এর কাছে ৯৭৮৭ ভোটে পরাজিত হয়েছে সিপিএম। অনুরূপভাবে বাখরি আসনে ১৭৩১৮ ভোটে সিপিআই পরাস্ত হয়েছে এলজেপি-র কাছে আর তেঘরা আসনে বিজেপি সিপিআই-কে হারিয়েছে ৩৫৩৬৪ ভোটে যেখানে এই দুটি আসনই ২০২০-র বিহার বিধানসভায় ছিল সিপিআই-এর দখলে।

বিহারে বাম-বিতাড়ন : মমতা ব্যানার্জি কি ঘাবড়াবেন?

মার্কসিস্ট, লেনিনিস্ট, কমিউনিস্ট আদি ইউরোপীয় মতবাদের বাম-মাওবাদী দলগুলিকে প্রস্থানের দরজা দেখিয়ে দিয়েছে বিহারের জনতা। ফলে এই দলগুলির দাপট পশ্চিমবঙ্গেও হ্রাস পাবে তেমন প্রত্যাশা অযৌক্তিক নয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পাকিস্তানি আইএসআই এবং তাদের প্রভুদের মতো বিদেশি শক্তির প্রভাব প্রবল বলেই এবং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত জনসমাজের এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশ আরবান মাওবাদী কম্প্রাডর হিসেবে বিদেশি শক্তির হয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে বলেই নিশ্চিতভাবে বলা সহজ নয় যে বিহারের লজ্জাজনক পরাজয় পশ্চিমবঙ্গেপ বাম-অতিবাম-মাওবাদী দলগুলির জোটকে আত্মসমীক্ষায় আদৌ উদ্বুদ্ধ করবে কিনা। মমতা ব্যানার্জি যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তর বাম শক্তিরই মুখোশ, তাই বিহারে বাম-অতিবাম-মাওবাদী শক্তির গোহারা পরাজয় তাঁর মনোবলকেও আঘাত করার কথা। মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক ক্যারিশমা যদি আদতে বৃহত্তর বাম শক্তির ক্যারিশমা এবং একজন মহিলার সহজাত নারীসুলভ ক্যারিশমার সম্মিলিত প্রতিফলন হয়, তাহলে বিহার নির্বাচনে বাম শক্তির এমন পরাজয় মমতা ব্যানার্জির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারে।

কী হতে পারে আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন বৃহত্তর বাম শক্তির ভোট কৌশল : বৃহত্তর বামশক্তি দেশের সামগ্রিক বিকাশের বিরোধী। সেই কারণেই জেএমএম, রাজদ, সপা, তৃণমূলের মতো বিকাশ বিরোধী দুর্নীতিগ্রস্ত দলগুলিকে ক্ষমতাসীন দেখতে চায় তারা। আর সেই কারণেই বিকাশপন্থী এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির এনডিএ-র ভোট ভাগ করার জন্য ভোটের ঠিক আগে দিয়ে দাঁড় করায় সম্পূর্ণ নতুন কোনো দলকে। যে দল নতুন বলেই তার বিরুদ্ধে থাকে না দুর্নীতির কোনোপ্রকার পূর্ববর্তী অভিযোগ। যেমন ঝাড়খণ্ডে 'জেএলকেএম', বিহারে 'জন সুরাজ পার্টি'। কিন্তু এমন দলগুলি এনডিএ-র ভোট নয়, ভাগ করে ফেলে আদতে প্রতিষ্ঠানবিরোধী ভোট। ফলে ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই একই কৌশলের প্রয়োগে লাভবান হওয়ার প্রয়াস করতে পারে বৃহত্তর বামশক্তি। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্র্যান্ড নিউ দলকে যদি দাঁড় করানো হয় প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভোটকে ভাগ করে বিজেপিকে পরাস্ত করতে, তাহলে বিস্মিত হওয়ার কারণ থাকবে না। রাঢ়বঙ্গের কিছু আসনে ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চাকেও যদি তৃণমূল বিরোধিতা করে লড়তে দেখা যায় বিজেপির কিছু অন্তত ভোট নিজেদের দিকে টেনে নিয়ে ওই আসনগুলিতে মমতা ব্যানার্জিকে জেতাতে, তাহলেও তা আশ্চর্যজনক হবে না। 'অভয়া'র মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করেও যদি গড়ে ওঠে নতুন কোনো রাজনৈতিক দল এবং তা নামে তৃণমূলের আপাত বিরোধিতায় এবং সেই সূত্রে তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভোট কাটে, সেক্ষেত্রেও তা আশ্চর্যজনক কিছুই হবে না।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রহণ কি কাটবে?

কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ সত্যের পরিবর্তন হবে না যে বিহারে দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্যর সিপিআইএমএল লিবারেশন এবং সিপিএম ও সিপিআইয়ের লজ্জাজনক হার হয়েছে। আশা করতে মন চায় যে তারা যেন তাদের বিদেশি মতাদর্শের রাজনীতি নিয়ে এদেশ চিরতরে ত্যাগ করে বিদেশের পথে পা বাড়ায়। আর পশ্চিমবঙ্গকে ফিরতে দেয় তার হিন্দু জাতীয়তার ভাবধারার শিকড়ে। মার্কসিস্ট, লেনিনিস্ট, কমিউনিস্ট আদি ইউরোপীয় মতবাদের নেতিবাচক ও প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিকে সেই ১৯৪১ সাল থেকে বহন করতে করতে হতক্লান্ত হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। আর মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে শতবর্ষপূর্তি ঘটবে সেই চরম অলক্ষুনে সময়ের যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের আকাশে লেগেছিল মার্কসীয় মতবাদের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ। সে গ্রহণ কাটেনি আজও। ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গে সাযুজ্যহীন বিদেশি এমন মতবাদগুলিকে অনুসরণ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে পড়েছে নরকগামী, অসহায়, হতদরিদ্র। মমতা ব্যানার্জির পরাজয়ই সেই গ্রহণ কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে দান করবে নবজীবন এবং এ রাজ্যের মানুষ তাদের হৃতসত্তাকে ফিরে পাওয়ার আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারত মায়ের কোলে, এমন আশা করতে দোষ কোথায়? বিহার নির্বাচনের ফলাফল জোগাচ্ছে সে আশা করার সাহস। □

সন্ত্রাস রপ্তানির তত্ত্ব

মহিলারা এখন জঙ্গিদের জন্য সুলভ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

প্রতিদিন খানিকটা করে সালসা খাওয়ানোর মতো। জঙ্গিবাদটাও তেমনই পাঠ। ভাবকুহেলিকা থেকে বেরোই এবার। মহিলাদের মন মায়ের মন, তাঁরা স্নেহের ছায়া বর্ষণ করেন— একথা যেমন সত্যি, আবার সেই সত্যিটাকে শিখণ্ডি রেখে অসংখ্য অপরাধ, মানবতাবিরোধী জেহাদি অপশক্তিও আনন্দগর্জন করছে। সারা বিশ্ব নড়ে চড়ে উঠেছিল যখন ২০১৫-র ডিসেম্বরে অরলিনে (দক্ষিণ পশ্চিম প্যারিস) অ্যান্টি টেরর পুলিশ স্কোয়াড এক দম্পতিকে আটক করে। সন্দেহ হয়েছিল স্ত্রীর গর্ভ দেখে। সন্তানসম্ভবা অবস্থায় যে জেহাদি উগ্রপন্থী সেদিন ঘুরছিল সেই নকল গর্ভ ছিল আসলে এক সুইসাইড বোমা! যে গর্ভ আমরা নবজাতকের জন্য সবরকমভাবে যত্ন করি, সেই আবেগের অপব্যবহার করে সেই মহিলা। জেন্ডার কার্ড অপব্যবহারের এর চাইতে নিকৃষ্ট উদাহরণ কিছুই হয় না। এর আগেও ২০০৬, তামিল টাইগার সুইসাইড বম্বার গর্ভবতীর ছদ্মরূপ ধরে শ্রীলঙ্কার মিলিটারি চিফ-সহ বহু মানুষের প্রাণ হরণ করে।

তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, আতঙ্কের আবহ তৈরির মাধ্যমে হাওয়া-জমি-জল দখল। তাদের সাংগঠনিক বিস্তার অপর্যাপ্ত। তাই পর্যাপ্ত সন্ত্রাসের দ্বারা বিশ্বময় প্রত্যক্ষ আঘাত হানে। আকাশ থেকে আনন্দ অবকাশ কেড়ে নিতে পারলেই নিষ্ঠুরতার কারাগারে মানুষকে বন্দি করা যাবে। এই হলো আধুনিক সন্ত্রাসের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গ আবারও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হলো, যখন দেখা গেল,

> **রমনীয় অবকাশ এখন ব্যর্থ শব্দ চয়ন। মহিলাসুলভ আচরণ এখন অতীত। মহিলা এখন জঙ্গিদের জন্য সুলভ। জঠরের কাজ কেবল স্নেহ উৎপাদন নয়, জঙ্গিদের জঠর সব গিলে পরিপাক করতে তৈরি।**

ভারতবিরোধী সন্ত্রাসে মহিলাদের যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। নারী ও সন্ত্রাসের বিষটি চট করে প্রথমেই মাথায় আসে না। যতক্ষণ না হাতেনাতে ধরা পড়ে, যতক্ষণ না সন্ত্রাসী ধ্বংস হয় ততক্ষণ একজন নারীকে কেউ চট করে সন্ত্রাসী ভাবতেই পারে না। এটাই আমাদের স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক গঠনের প্রতিবর্ত। একজন মহিলাকে ঝগড়ুটে, জাঁদরেল, জেদি, রাগী, মিথ্যাবাদী, বড়জোর ছিঁচকে চোর, এমনকী লাস্যময়ী, মোহময়ী বলে পর্যন্ত মাপতে থাকি। কিন্তু সন্ত্রাসী সংগঠনের অংশ? সন্ত্রাসী ছকের অংশ? এতটা ভাবার অভিপ্রায়টাই যে আমাদের হয় না। আর সেই সুযোগটাই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে শাহীন সিদ্দিকী, আফিরাহ বিবির মতো জঙ্গি সংগঠনের মহিলারা।

সদ্য দিল্লি বিস্ফোরণ টনক নড়াল সারা ভারত-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার। পৃথিবীরও। এই কাণ্ডে ধৃত মহিলা চিকিৎসক শাহীন সিদ্দিকীর সঙ্গে যোগ পাওয়া গেল পুলওয়ামা হত্যাকাণ্ডের মূল চক্রী জইশ নেতা উমর ফারুকের স্ত্রী আফিরা বিবির সঙ্গে। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামা জঙ্গি হামলায় ৪০ জন ভারতীয় বীর জওয়ান বীরগতিপ্রাপ্ত হন। তারপরেই জইশ নেতা উমর এনকাউন্টারে মারা গেল। জইশ তারপর নড়েচড়ে বসল। জোরদার ভাবে মাঠে নামল এক মহিলা সংগঠন তৈরির কাজে আর হাতে-হাতে পুরুষের সঙ্গে জঙ্গি সঙ্গী হয়ে থাকা নয়, পুরোপুরি ভাবে পাকা গিন্নির মতো পাকাপাকি জঙ্গি তৈরি করার প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি হলো। তৈরি হলো জামাত-উল-মোমিনাত। মহিলাদের জঙ্গি সংগঠন, যার প্রধান পদে নিহত উমরের স্ত্রী। এই দিল্লি বিস্ফোরণের আগে আফিরা এই জঙ্গি সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠকে যোগদান করে। মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। ডাক্তার শাহীন আবার সাদিনার ঘনিষ্ঠ। নেটওয়ার্ক যথেষ্ট পাকা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২০১৭ সালে হিজবুল কমান্ডার বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর থেকেই প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে ভারতের সেনা থেকে শান্তির

পরিবেশ। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের টেরর লঞ্চ প্যাডগুলিতে অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি কার্যকলাপ সতেজ রাখতে প্রতিনিয়ত সক্রিয় মহিলারা। জম্মুর পুঞ্চ ও রাজৌরি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, কারণ বিচ্ছিন্নতাবাদের মদত দিতে আঞ্চলিক ভাবে অনেক সময়ই মহিলারা সামনে আসছে। যেমন— নেত্রী আসিয়া আনদ্রাবি। কাশ্মীর উপত্যকায় ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রপাগান্ডার নায়িকা সে। মহিলাদের নানান পদ্ধতিতে মানসিক উসকানি এবং অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ। কতবার কতজনের মন যে সংক্রমিত হচ্ছে তা কিন্তু কোনো ইন্টেলিজেন্সের পরিসংখ্যানেই পাওয়া যায় না!

আজ এই ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের আবহে যখন পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে মানুষের ওপারে ফেরার ঢল, তখনও প্রাসঙ্গিক হচ্ছে বাংলাদেশের জেহাদি রপ্তানির তত্ত্ব। অনুপ্রবেশকারীরা যে কাঠি কুড়াতে বা চোরাই মাছের কারবার করতেই এপারে থাকত এটাতো সহজ ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ মানে ধরেই নেওয়া যায় সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ, যারা আতঙ্ক তৈরির ঠিকে শ্রমিক। অদ্ভুত ভাবে সময়ের সাদৃশ্য পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং বাংলাদেশের মহিলা জঙ্গি সংগঠন তৈরির কালক্রমে। সেই ২০১৭, অর্থাৎ বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পরেই। জেহাদি ল্যান্ডস্কেপে মহিলা পদক্ষেপ আর টলমল নেই। তারা দৃঢ়, সক্রিয়। ২০১৬ হোলি বেকারি অ্যাটাকের পর এটাও পরিষ্কার হলো, আইএসআইএস মহিলাদের ভূমিকা ফেলনা নয়। চাটগাঁতে মহিলা সুইসাইড বোম্বার সাকিরাও প্রো আইএসআইএস সংগঠন 'নিউ জামাউল মুজাহিদ্দিন বাংলাদেশ'-এর মিলিটারি রাশিদুর রহমানের স্ত্রী। ধরেই নিতে পারি— জঙ্গিদের সহধর্মী বোন, দিদি, সবাই-ই কোনো না কোনো ভাবে জঙ্গি কার্যকলাপের সক্রিয় অংশ। তাই, 'বাড়ির লোকজন কিছুই জানে না' ধরনের বয়ান যখন বাণিজ্যিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায়, তখন তা হাসির খোরাক। ঢাকা, শিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, চাঁটগাঁ মহিলা জঙ্গিদের ডেরা। একথা কল্পনা নয়। শেখ হাসিনার আমলে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রানজিশানাল ক্রাইম বাংলাদেশের থেকেই এমন রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছিল।

প্রসঙ্গত, নিউ জামাতউল মুহাজাদ্দিন বাংলাদেশের (নিউ জে এম বি) বর্তমান উদ্দেশ্যই হলো তরুণীর সংখ্যা বৃদ্ধি, জঙ্গিদের সঙ্গে তরুণীদের বিয়ে দেওয়া, পরিবারের বাকি মহিলাদের জেহাদি কার্যকলাপের প্রশিক্ষণ দেওয়া। ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪, আসমা আখতার এক স্বভাবসিদ্ধ মহিলাপনার ঘোমটা ধরে অসম সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল। ঘটনাক্রমে তাকে সেদিন অসম পুলিশ সন্দেহ করে। কালবিলম্ব না করে সীমান্তের ওপারে পুশব্যাক করেছিল। আসমারা কিন্তু হাতে এ কে ৪৭ নিয়ে আসবে না। আসমারা ঘোমটা ও নকল গর্ভের আড়ালে জঙ্গিপনা বিস্তার করে। তারা কখনো পরিচারিকা, কখনো রাঁধুনি। মুখচোরা মেয়েলিপনা ভাজা মাছটি উলটে খেতে পারে না'র ভাবখানার জন্য ওদের উপর কেউ সন্দেহ করে না। দারিদ্রের উপর আরও বড়ো মুখোশ ওই অস্ত্র। যতক্ষণ না দুষ্কর্ম ঘটে তার আগে কাউকেই সন্দেহ করা মানে তা হবে আইন বিরুদ্ধাচার, সংবিধান লঙ্ঘন, মানবাধিকারে আঘাত। টেরর আউটফিটে যখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার তানিয়া পারভিন ছিল তখন তাকে কে সন্দেহ করেছিল? দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার তানিয়া পারভিনই হুগলির প্রজ্ঞা দেবনাথ ওরফে আয়েশা জন্নত মোহনার ঘনিষ্ঠ। জামাত যোগ দু'জনেরই। তানিয়া আবার লসকর-ই-তৈবার সদস্য। বাংলাদেশের জেএমবি-র মহিলা শাখার প্রধান আসমানি খাতুন এমন সব মেয়েদের সন্ধানে ঘুরঘুর করে। যারা নিষ্পাপ মুখে ভারত বাংলাদেশে অবাধ বিচরণ করবে, দরকারে বৈধ কাগজপত্রও দেখাবে। সবাই-ই যে অনুপ্রবেশের পর ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি করে রাঁধুনির কাজ করবে এমন কেন!

বহুস্তরীয় জঙ্গি কার্যকলাপ বোধহয় এমনই। মহিলা ডাক্তার থেকে কলেজ ছাত্রী, জঙ্গিদের স্ত্রী, বোন থেকে পরিচারিকা। মহিলাদের যত বেশি যুক্ত করা যাবে তত বেশি জঙ্গিপনা পাকা জায়গা নেবে। Gender on Terrorism নাড়িয়ে দিচ্ছে সব পুরনো ধ্যানধারণা। ২০১৬-তে বাংলাদেশের অশোকা হজ ক্যাম্পে যখন মহিলা জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটাল— কোথাও গিয়ে মনে হয়— ওটা ট্রায়াল রান ছিল। মহিলা জঙ্গিদের ঘরে নেট প্রাকটিশ ছিল বললেও খুব ভুল হবে না। ১৯৮৩-তেই আর্জেন্টিনার সমাজবিদ জর্জশ আবাই ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার সুরে বলেন, মহিলাদের সঙ্গে সন্ত্রাস যোগ হবে আগামীতে। Dogmatic terrorism-এ মহিলাদের যোগ তৈরি হচ্ছে এবং এরাই আগামীতে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করবে। পাওয়ার স্ট্রকচার স্টিরিওটাইপ বদলে গেল, দেশ সুরক্ষার দায়িত্ব মহিলাদের হাতে, তাই দেশ দংশনেও মহিলা সংগঠন। না, ইতিহাস এখনো ভোলেনি লায়লা খালিদাকে। ১৯৬৯ সালে একটা আস্ত বিমান হাইজ্যাক করেছিল যে মহিলা। ২০০৪-এ 'Chechnya Black Widows' মস্কোর যাত্রীবাহী একটা ট্রেন উড়িয়ে দিল।

২০১০ সালে মস্কো টেরর অ্যাটাক করেছিল মহিলা জঙ্গির দল। আইএসআইএস তৈরি করেছে 'আল খানশাহ' বিগ্রেড, যাতে সবাই মহিলা। নেটওয়ার্কিঙে তারা অত্যাধুনিক। বিশ্বব্যাপী তারা পরিচিত 'জেহাদি ব্রাইডস' নামে। কেউ মগজধোলাই করে, কেউ বিস্ফোরক রাসায়নিক সাপ্লাই করে, কেউ নিজেই আত্মঘাতী বোমা, কেউ বোমা ফেলে। প্রপাগান্ডার জোর অনেক বলেইতো তরুণীদের টানতে পারছে জেহাদি সংগঠনগুলি। যে সময়ে তাদের কফি শপে বসে আড্ডার বয়স, তখন তারা কফি শপে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। ভারতের বিরুদ্ধাচার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, যে জইশ-ই-মহম্মদ সংগঠন কখনো মেয়েদের সরাসরি সশস্ত্র অভিযানে যুক্ত করত না, তারাই আজ জামাত উল মোমিনাতের মতো only ladies terrorists গ্রুপ বানাল! ভারতে আন্ডারকভার নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য যারা নারীবিদ্বেষী জড় ভাবধারার পুরুষ, তারাই তাদের মহিলাদের 'সংগঠন'-এ যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে। এর থেকেই অনুমেয় যে, ভারত বিদ্বেষের হিড়িক কী তীব্র।

যখন উমর খলিদের বউ মহিলা জঙ্গি সংগঠনের বহুস্তরীয় প্রপাগান্ডা করছে, ঠিক তখনই জম্মুর ডাংরি থেকে তৈরি রেখা শর্মার মতো বীর যে নিজের জেদে বন্দুক তোলেন। গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা দেয় পাকিস্তান জঙ্গিবাদের মোকাবিলার— যার পোশাকি নাম Village Defence Guards। তিন সন্তানের মা। কাশ্মীরে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' উদ্যোগের চেয়ারপার্সন এবং রাইফেলে বিশ্বাসী। Village Defence Guards-এর তীব্র বিরোধ করেন উমর আবদুল্লা। হাতে রাইফেল মানে তা নাকি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরোক্ষ ব্যর্থতা। এরা ভাষণেই দেশের উপত্যকার সুরক্ষার কথা বলে খালাস। যে পদক্ষেপেই আসুক তাতেই বিরুদ্ধাচার। এই বিরুদ্ধাচারগুলোও জইশ থেকে আইএসআইএস সবাইকে আনন্দ উদ্যোগ দেয়। রমনীয় অবকাশ এখন ব্যর্থ শব্দ চয়ন। মহিলাসুলভ আচরণ এখন অতীত। মহিলা এখন জঙ্গিদের জন্য সুলভ। জঠরের কাজ কেবল স্নেহ উৎপাদন নয়, জঙ্গিদের জঠর সব গিলে পরিপাক করতে তৈরি। □

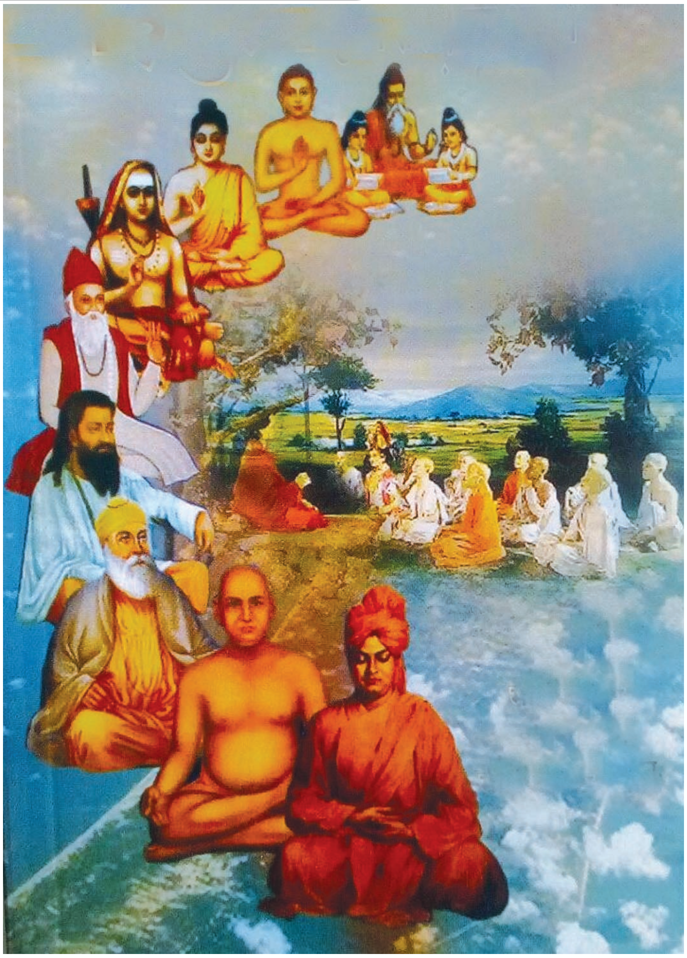

হিন্দুত্বের সংজ্ঞা বর্তমানের প্রেক্ষিতে

শ্রী অরুণ কুমার

(গত সংখ্যার পর)

বিশ্বের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর

হিন্দুত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যা দানের সময় বর্তমান বিশ্বে সৃষ্ট সমস্ত সমস্যা ও প্রশ্নাবলীর সমাধান সূত্র আমাদের দেওয়া কর্তব্য। কেননা এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের উপায় একমাত্র ভারতীয় আদর্শের মধ্যে রয়েছে। বর্তমানে তো নতুন নতুন বিষয়কেন্দ্রিক কথাবার্তা শুরু হয়েছে, যেমন লিভ-ইন, সমলৈঙ্গিকতা ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় ভারতীয় সমাজে কখনও ছিল না এমন নয়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবকদের জন্য একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলার মাধ্যমে বুঝতে পারা গেল যে তাদের জিজ্ঞাস্য বহু প্রশ্নের সঙ্গে সাধারণ সমাজের কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে আজও আমাদের দেশে বহু সংখ্যক ব্যক্তি আর্থিক, শিক্ষা-বিষয়ক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ রয়েছে। এদের জন্য সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে চিন্তাভাবনা করা দরকার। যুবকদেরও এই সমস্ত বিষয়ে গুরুত্বদান করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য দান করলে বোঝা যাবে যে সমাজকে যারা বিভ্রান্ত করতে চাইছে তারা অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মূল ও অত্যাবশ্যক বিষয় হিসেবে প্রচার করছে এবং আমরা ওই সমস্ত নগণ্য বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছি এবং সেগুলির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করছি। উপরোক্ত সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সমাজ বহু আগেই চিন্তাভাবনা করেছে। সমাজ সর্বদা অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষালাভ করে এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই মানুষের বিকাশযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। আমাদের সমাজ বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করে উপলব্ধি করেছে যে পরিবার ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। মানুষ একত্রে বসবাস করে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করেছে এবং অনুভব করেছে যে পরিবার ব্যবস্থা সমস্ত সমস্যা সমাধানের এক অবিকল্প পদ্ধতি। বিগত শতবর্ষে পাশ্চাত্য দেশের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ বিশ্ববাসী মিথ্যা প্রচারের শিকার হয়েছে এবং আজও একইভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের নিজস্ব জীবন ব্যবস্থাকে সযত্নে লালন করতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার বিবাহ-ব্যবস্থার বর্ণনা আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে রয়েছে। ঋষি শ্বেতকেতু বিবাহ-পরম্পরা বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে বিভিন্ন বিবাহ-বিধির বিধান রয়েছে। যেমন দেববিবাহ, ব্রাহ্ম, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব, আসুরিক, পৈশাচিক ও বৈদিক বিবাহ। এই সমস্ত বিবাহ-পদ্ধতি প্রত্যেকটি আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত এবং এই সমস্ত ব্যবস্থাকে বহিরাগত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। নল ও দময়ন্তীর মধ্যে বিবাহঐতিহ্য অনুসারেই সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু এত সব ব্যবস্থার বিধান দেওয়ার পরও সমাজ জীবনে যা শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ও আদর্শস্বরূপ। তাকেই সমাজ অনুসরণ করেছে এবং বংশ পরম্পরানুযায়ী সেই সমস্ত ব্যবস্থাকে সমাজ পালন করে চলেছে। বর্তমানে আমাদের সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে যে পথ অনুসরণ করছে তার পরিণতি বিষয়ে সমাজকে সতর্ক করা আমাদের কর্তব্য এবং এহেন জীবনযাত্রার পরিণতি উপলব্ধি করে মানুষ সঠিক আচরণ কীভাবে করতে পারে তার উপায়ও অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই সমস্ত অনুসন্ধান ক্রিয়া সঞ্চালনের জন্য যে

পারস্পরিক মত বিনিময় প্রয়োজন তার ভিত্তি হলো পরিবার। ফলে পরিবার ব্যবস্থার গুরুত্ব বিষয়ে প্রত্যেকের উপলব্ধি সৃষ্টি করা একান্ত দরকার। কিন্তু এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অকারণ তর্ক-বিতর্কে যুক্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমেরিকার ভয়াবহ বাস্তব পরিস্থিতি

কিছুদিন আমেরিকাতে 'Fatherless America' নামে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। শিশু ও বালকদের মধ্যে তথ্য নির্ভর হিংসার বর্ণনা পুস্তকটির উপজীব্য। এই তথ্যানুযায়ী ৪৮ শতাংশ আমেরিকার যুব সম্প্রদায় তাদের পিতার নাম জানে না। এই অনুপাত ৬০ শতাংশও হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মহিলারা। যুবক-যুবতীর ইচ্ছানুসারে তাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে বিবাহ যেমন হচ্ছে তেমনি বিচ্ছেদও ঘটছে এবং বিবাহবিচ্ছেদের পর শিশু তার মায়ের কাছেই লালিতপালিত হয়। কিন্তু যখন ওই মহিলা দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন সেই শিশুকে নিজের কাছে রাখা তার কাছে এক সমস্যা হয়ে ওঠে। কারণ ওই শিশুর তো তার পিতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে শিশুর মধ্যে ক্রোধ, হিংসা, অশোভন আচরণ ইত্যাদি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির মূল কারণ হলো যে সেখানে পরিবার ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়েছে। শিশুকে লালন পালন কেবলমাত্র মা-ই করতে পারেন না—মাতা ও পিতা উভয়ে যৌথভাবে এই কাজ করে থাকেন। ২০২২ সালে আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে শিশু ও বালক দ্বারা মোট ৬০০টি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। এহেন ঘটনা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করছে যার মূল কারণ আমেরিকাতে পরিবার ব্যবস্থার বিনাশ। এই পরিবার ব্যবস্থা হলো হিন্দু সমাজের জীবন যাত্রার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যাকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করার জন্য আলোচনা ও প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।

বিগত দিনে সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এক বিশেষ মামলার শুনানি গ্রহণ করছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন ভারতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান হয়ে গেছে, কেবলমাত্র একটি বিষয় বর্তমানে বাকি আছে

কারও পরিচিতিকে বিনষ্ট না করে সকলের সমবেত সহযোগিতায় অগ্রসর হওয়ার উপযুক্ত উপায় হলো হিন্দুত্বের বিচারধারা।

যার সমাধান অতি দ্রুত করা দরকার। তিনি এই শুনানি সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ঋগ্বেদে দুটি মানসিক স্থিতির উল্লেখ রয়েছে — প্রকৃতি ও বিকৃতি। এই শুনানির বিষয়টিও ছিল এক প্রকারের প্রকৃতি যার স্বরূপ কেমন হবে সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু এই প্রকৃতি তো সমাজ-জীবনেই অবস্থান করবে। সমাজে এমন ব্যক্তিও থাকবে এবং সমাজে তার এক বিশেষ স্থানও থাকবে। আমরা এই বিষয়কে কখনও অপরাধ বলে গণ্য করিনি। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মজহব ও খ্রিস্টান রিলিজিয়ন একে অপরাধ হিসেবেই গণ্য করে। এইজন্য সর্বোচ্চ আদালতে যে মামলা দায়ের হয়েছিল তার বিষয় ছিল 'Deeriminalisation of same sex relationship.' সমস্ত প্রকারের সম্পর্ককেই বিবাহ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, কারণ বিবাহের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভাবনা ও মানসিকতা রয়েছে। বিবাহ ও যেকোনো ধরনের সম্পর্ককে আমাদের সমাজ সমান রূপে বিবেচনা করেনি। বিবাহ হলো একটি সংস্থা। ভারতীয় সমাজে পরিবার ব্যবস্থা হলো একটি একক স্বরূপ এবং পরিবারের ভিত্তিই হলো বিবাহ যার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র যৌন সম্পর্ক নয়। বিবাহ হলো এক ধরনের সংস্কার যার মধ্যে রয়েছে উদাত্ত উদ্দেশ্য। সমাজে এহেন অবৈধ সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তি থাকবে কিন্তু সেই সম্পর্ককে বিবাহ বলা যাবে না। এদের সম্মান ও নাগরিক অধিকার সমাজে বজায় থাকলেও সন্তানের পিতৃ-মাতৃ পরিচয় দানে যথেষ্ট সমস্যা সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। সমস্ত প্রকারের সম্বন্ধকে সেই কারণে বিবাহ বলা যাবে না।

স্থায়ী হিন্দুজীবন পদ্ধতি

বিগত কিছু সময়ব্যাপী স্থায়ী উন্নয়ন (Sustainable Development) SDGs (Sustainable Development Goals) ইত্যাদি অনেক বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনা চলছে। বাস্তবে এই সমস্ত আলোচনার পরিণামস্বরূপ কোনো উদাহরণ আজও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পরিবেশ সংরক্ষণ, মানব অধিকার, বৈষম্যহীন সমাজ ইত্যাদি বিষয়ের সমাধান সূত্র একমাত্র হিন্দুত্বেই নিহিত রয়েছে—অন্য কোনো ভাবেই এগুলির সমাধান সম্ভব নয়। এই সমস্ত সমস্যার বিষয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারতে এক বিশেষ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। যদি বাঘ বা বন্যপ্রাণীর জীবন রক্ষা করতে হয় তবে তার জন্য প্রথম প্রয়োজন বনসৃজন ও বনসংবর্ধন। কিন্তু অরণ্যবাসী জনজাতি সমাজকে যদি রক্ষা করা না যায় তবে বন রক্ষাও সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের জনসমাজ সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সকলেই একত্রিতভাবে বসবাস করে, সকলের জন্য সকলেই পরিপূরক—এমন এক সমাজ ব্যবস্থা এখানে তৈরি করা হয়েছিল। বাঘ বা বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য অভয়ারণ্যের প্রয়োজনের জন্য জনজাতি সমাজকে বন থেকে উৎখাত করলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এই সমস্ত বিষয়ের উত্তর কেবলমাত্র হিন্দু চিন্তাধারায় নিহিত আছে।

ত্রিস্তরীয় সমাজ ব্যবস্থা

উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের এখানে ত্রিস্তরীয় সমাজ রচিত হয়েছিল--- যথা নগরকেন্দ্রিক, গ্রামকেন্দ্রিক ও বনকেন্দ্রিক। এই তিনটি সমাজের জনগোষ্ঠী পারস্পরিক সম্পর্কে যুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে সামাজিক পার্থক্য কখনই লক্ষ্য করা যায়নি। বসবাসের স্থানানুযায়ী কেবলমাত্র সমাজের নামের পার্থক্য ছিল যথা অরণ্যক সমাজ, নাগরিক সমাজ ও

গ্রাম্য-সমাজ। এই তিনটি জীবন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্থানানুযায়ী যতটুকু পার্থক্য থাকা প্রয়োজন কেবলমাত্র ততটুকুই পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। পুরাতত্ত্ববিদ পদ্মভূষণ শ্রী হরিভাউ ওয়াকনকর 'ভীমবেটকা' গুম্ফাতে গিয়ে সেখানে অনুসন্ধান করে বলেছেন— "আমি গুম্ফার চিত্রশৈলী লক্ষ্য করেছি। বনে গিয়ে ভিত্তি চিত্র দেখেছি এবং গ্রাম বা নগরে গিয়ে আলপনা, গোদনা বা পেইন্টিং যখন দেখেছি তখন এই তিন স্থানের চিত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাইনি। চিত্র ও অন্তর্নিহিত ভাব সমান রয়েছে, কেবলমাত্র রঙের পার্থক্য রয়েছে। আমাদের সম্পূর্ণ সমাজ জীবনে গ্রাম ও বন ছিল পরস্পর সম্পর্কিত। গ্রামের চতুর্দিকেই ছিল বন, আবার গ্রাম ও বনের সঙ্গে নগর ছিল যুক্ত— এই ছিল আমাদের সাধারণ সমাজ ব্যবস্থা। মহাভারতের যুদ্ধের শেষে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী যখন একত্রে বসবাসের উদ্দেশ্যে বনগমন করেন তখন কিন্তু ছত্রিশগড় যাননি, হস্তিনাপুরের বাইরেই অবস্থিত বনে গিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন বনগমন করেন তখন কোশলের সীমা অতিক্রম করে চিত্রকূটের জঙ্গলে অবস্থান করেছিলেন। বনক্ষেত্রে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। কারণ এখানে বন একটি পৃথক ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। বর্তমানে তো ভীল প্রদেশ, গোন্ডারাজ্য বিষয়ে আলোচনা হয়। এই ধরনের কোনো পৃথক ক্ষেত্র ভারতে রচিত হয়নি। কেবলমাত্র ত্রিস্তরীয় সমাজে কিছু জনগোষ্ঠী নগরে, কিছু গ্রামে, আবার কিছু জনতা বনক্ষেত্রে বসবাস করতো এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রের জনগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা ছিল সুউন্নত। কোনো জনগোষ্ঠীই পশ্চাৎপদ ছিল না। বিদেশি আক্রমণকারীদের সঙ্গে সংগ্রামের কালখণ্ডে বর্তমানের পৃথক জঙ্গল রাজ্যের ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে এবং ইংরেজরা এমন সব আইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিল যার ফলে সমাজের এক বৃহত্তর অংশ আজ পশ্চাৎপদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

সমৃদ্ধ সমবায় ব্যবস্থা

ধর্মপাল লিখিত পুস্তকে ইংরেজ আগমনের আগের ভারতের সমাজের তথ্যনির্ভর বিবরণ রয়েছে। ১৮০০ সালে বিদ্যালয় সংখ্যা কত ছিল? সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে কতজন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী ছিল? শিক্ষকরা কোন জাতির অন্তর্গত, দেশের মধ্যে কতজন রাজা ছিলেন? তাঁরা কোন জাতির অন্তর্গত ছিলেন? বর্তমানের হিসেবে তাদের মধ্যে কতজন তপশিলি জাতি এবং কতজন অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতির অন্তর্গত ছিলেন—এই সমস্ত তথ্যাদি পুস্তকটিতে রয়েছে। যদি এই তথ্যগুলির বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে ইংরেজরা কী ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেছিল। পুস্তকটিতে যে সমস্ত বিবরণ রয়েছে তার মধ্যে ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়ার এক বিশেষ ধরনের কাপড়ের চাহিদা সংবলিত একটি পত্রের উল্লেখ রয়েছে–তিনি এক উৎকৃষ্ট মানের কাপড় চেয়েছিলেন। কোম্পানির আধিকারিক তথ্য প্রদান করেছেন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুখ্য ব্যবসায়ী কাশীর বীরন্না এবং তার আত্মীয় বেদী তিমন্না করমণ্ডল উপকূলবর্তী সম্পূর্ণ কাপড়ের ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই কেবলমাত্র এই কাপড় সরবরাহ করতে পারে। পরে তিনি লিখেছেন যে এই দুজন ব্যক্তি জাতিতে জোলা অর্থাৎ তাঁতি। ভারতে প্রত্যেক জাতির মধ্যে ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকার ছিল। জোলা (তাঁতি)-রা কাপড়ের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতো এমন প্রমাণ এখানে নেই। ভারতের সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর লোক উৎপাদকের এক একটি সঙ্ঘ রূপে সমবেতভাবে কাজ করতো। সঙ্ঘের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ছিল যাদেরকে 'পনী' বলা হতো, আবার পনীদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠী বলা হতো। এরকম সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালনার ব্যবস্থা ভারতে গঠিত হয়েছিল। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিত্তশালী ব্যবসাদার ছিল, এমনকী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনা করার মতো ব্যক্তি ভারতে তখন ছিল। আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে আগের এমন পরিস্থিতির কোনো সাদৃশ্যই লক্ষ্য করা যাবে না।

উপসংহার

আলোচনার সূচনাতেই বলা হয়েছে যে এই সমস্ত বিষয়ের এক হাজার বছরের পটভূমিকা রয়েছে। হিন্দুত্ব বিষয়ে বিশ্লেষণের সময় এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি নজর রেখে শব্দ চয়নে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কোনো ধরনের চক্রান্তের শিকার যেন আমরা না হই। কিছু বিষয়ে কিন্তু দৃঢ়তা প্রদর্শনের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি ও কুরুচিকর মন্তব্য অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। যা খারাপ তাকে খারাপ হিসেবেই মানতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ইতস্ততের ভাব দেখানো উচিত হবে না। যে সব বিষয় আমাদের আদর্শের অনুরূপ, তথ্যনির্ভর, সময়োপযোগী যুগানুকূল, সেগুলি আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য। কিছু এমন বিষয় রয়েছে যা আমাদের আদর্শের পরিপন্থী সেগুলিকে অস্বীকার করা প্রয়োজন। কোনো প্রকার বিভাজন বা বিভেদকে আমরা স্বীকার করি না। বর্তমানের স্মৃতিশাস্ত্র হলো সংবিধান যা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বেরই আত্মআস্বরূপ একথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। হিন্দুত্বের বিশ্লেষণের সময় অধ্যাত্মিকতা, সমৃদ্ধি, আধুনিকতা, প্রাচীনত্ব, একাত্মতা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করা একান্ত দরকার। কারও পরিচিতিকে বিনষ্ট না করে সকলের সমবেত সহযোগিতায় অগ্রসর হওয়ার উপযুক্ত উপায় হলো হিন্দুত্বের বিচারধারা।

সময়ানুসারে আত্মাবলোকন করে, সমাজের বিভিন্ন আচরণের ও পদ্ধতির ন্যূনতাকে সংস্কারিত করে, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাজোপযোগী নতুন নতুন প্রথা গ্রহণ করার পদ্ধতি হলো জীবন্ত সমাজের লক্ষণ। বক্তব্যের ভাষা যেন সমকালীন প্রজন্মের বোধগম্য হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্যদান করা উচিত। মূলাদর্শের সঙ্গে আপোশ বা রফা না করে যুগানুকূল ব্যবস্থা রচনা হলো ভারতবর্ষের ঐতিহ্য–এই কথা স্মরণ রেখে তদনুরূপ হিন্দু চিন্তাধারার ও আদর্শের বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি বিষয়ে আমাদের প্রত্যেককে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(শেষ)

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ)

প্রসঙ্গ : শ্রম বিধি

সংঘাতের মধ্য দিয়ে আর যাই হোক, উন্নয়ন আসে না। উন্নয়ন আসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে। শ্রম বিধির মধ্যে শ্রমিক ও মালিকদের ভাবনার প্রতিফলন ঘটানোই সরকারের কাজ। কোনো শিল্পে শুধু শিল্পপতি অথবা শুধু মাত্র শ্রমিক দিয়ে কাজ চলে না। তাই চাই শ্রমিক ও মালিক উভয়পক্ষেই। ঠিক মতো বলতে গেলে বলতে হয়, দরকার পয়সা আর পসিনা (ঘাম)। পুজি আসে মালিকের কাছ থেকে আর ঘাম ঝরায় শ্রমিক কুল। সমস্ত শ্রম বিধিতে তাই শ্রমিক ও মালিকদের স্বার্থ দেখতেই হয় সরকারকে। মালিকদের স্বার্থ না দেখলে তারা শিল্প গড়তে আসবে কেন? রাজনীতি ও সরকার পরিচালনা এক জিনিস নয়। সরকার যেমন শ্রমিকের স্বার্থ দেখতে দায়বদ্ধ। ঠিক তেমনি সরকার মালিকদের স্বার্থ দেখতেও দায়বদ্ধ। দেশে শিল্প গড়ার স্বার্থেই এই দায়বদ্ধতা।

সরকার যত শিল্প গড়ার পরিবেশ তৈরি করবে ততই শিল্পপতিরা শিল্প গড়তে আগ্রহী হবে। শ্রমিকদের সামনে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে যারা মালিকঘেঁষা তকমা লাগিয়ে দেয়, তারা নিজ নিজ রাজ্যে শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য কী কী করেছে তা কেন জানাচ্ছে না? যে মমতা ব্যানার্জি সরকার বলছে 'শ্রম' যুগ্ম তালিকায় আছে, তারা শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য কী করেছে তাও ঠিক মতো জনগণের জানা উচিত। এরা তো রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেয় না। এতে কি সাধারণ কর্মীদের কষ্ট হয় না? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিল্প আনার জন্য কি মালিককে সস্তায় জমি ও বিদ্যুৎ দেয় না? সেই জন্যই তো সৌরভ গাঙ্গুলিকে শালবনীতে জমি দিয়েছে শিল্প গড়ার জন্য। যদিও সৌরভ গাঙ্গুলির ঘোষিত স্টিল কারখানা এখনও তৈরি হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করার জন্য শ্রমিক দরদি সাজলে কাজের কাজ কিছু হবে না।

আমাদের রাজ্যে সিপিআইএম-এর নেতৃত্বে যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল তখন তাদের অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন সিটু পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের জন্য যে বেতন চাইতো, তার থেকে অনেক বেশি কেবল চাইতো অন্য রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কর্মরত শ্রমিকদের জন্য। এরা সরকার বাঁচাতে শ্রমিকদের বলি দিতেও পারে। আজ এই রাজ্যে এরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতায় মমতা ব্যানার্জির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। দেশের পক্ষে এরা ভয়ংকর বিপদ। আর যাই হোক, মমতা ব্যানার্জি সরকারের এই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতার অবস্থানের কারণে আমাদের রাজ্যে কোনো শিল্পপতি শিল্প গড়তে আসবে না। ক্ষতি হবে পশ্চিমবঙ্গের যুবকদের। পরিযায়ী শ্রমিক হয়েই কাটাতে হবে তাদের। এটাই ভবিতব্য। সকল শ্রমিককে নিয়োগ পত্র দেওয়া, সময়মতো ন্যূনতম মজুরি দেওয়া, মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকের সম কাজে সম বেতন, চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে এতদিন তো কলকারখানার গেটে গলা ফাটানো হতো। সরকার এখন তা দিতে চাইলে আপত্তি কেন? শ্রমিকদের রাজনৈতিক বোড়ে ভাবা অবিলম্বে বন্ধ হোক।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

তৃণমূল জমানায় অমিল সরকারি চাকরি

পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সরকারি চাকরি পাওয়া আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুটোই বলা যেতে পারে। বর্তমান শাসকদলের (তৃণমূল কংগ্রেস) যেকোনো ছোটো নেতা থেকে শুরু করে বড়ো নেতা-মন্ত্রী, সবাই কিন্তু 'দুর্নীতি' নামক বিষয়টায় পিএইচডি করা। চাল চুরি থেকে বালি, বালি চুরি থেকে কয়লা, কয়লা থেকে গোরু চুরি, আবার সেটারই বর্তমান সংযোজন 'শিক্ষা চুরি' বা 'চাকরি চুরি'। 'চাকরি চুরি' বিষয়টা কিন্তু অনেকদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গে একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে; বামেদের আমলে 'চিরকুটের' মাধ্যমে চাকরি দেওয়া হতো, আর তৃণমূলের আমলে 'নোটের' মাধ্যমে দেওয়া হয়, এটাই শুধু পার্থক্য। তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির বান্ধবীর ফ্ল্যাট থেকে 'চাকরি চুরির' নগদ ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছিল, যা ছিল আমাদের মতো সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে অকল্পনীয়! তারপর এক এক করে ছোটো নেতারা গ্রেপ্তার হলো, যাদের আদর্শ অভিষেক ব্যানার্জি এবং মমতা ব্যানার্জি।

তৃণমূল সরকারের সংঘটিত এই 'চাকরি চুরি' পুরো পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। একদিকে, সরকারি স্কুল-কলেজ অর্ধেক বন্ধ হওয়ার মুখে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়ের অভাবে; অপরদিকে, প্রত্যেক বছর তো আর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাও হচ্ছে না এই তৃণমূল সরকারের আমলে এবং যে বছর পরীক্ষা হচ্ছে, রেজাল্ট বেরোতে বেরোতে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে কিন্তু রেজাল্টের আর দেখা নেই! রেজাল্ট বেরোলেও, ইন্টারভিউ কবে হবে, সেটাও অনিশ্চিত এবং তার সঙ্গে দোসর তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীর 'টাকার বিনিময়ে' চাকরি দেওয়া। এই কারণেই যোগ্য- অযোগ্য নির্বিশেষে সবার চাকরি চলে যেতে দেখলাম আমরা এই সরকারের আমলে। যারা নিজের যোগ্যতা দিয়ে, দিনে ১০-১২ ঘণ্টা পড়াশোনা করে চাকরিটা পেল, তাদের চাকরিও চলে গেল এবং যারা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেল, তাদের চাকরিও গেল—যার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তৃণমূল কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলটা!

তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, ততদিনে সরকারি চাকরি কী, সেটাই হয়তো মুছে যাবে। যেসব স্কুল শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে শিক্ষকতা ও সরকারি চাকরি করার স্বপ্ন দেখে, সেটা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। কারণ তৃণমূলের আমলে সরকারি চাকরি পাওয়া যাবে না! সুতরাং, '২৬-এ শেষ সুযোগ আছে যে এই রাজনৈতিক দলটাকে ক্ষমতা থেকে সরানো, সরকার পরিবর্তনই একমাত্র সমাধান আমাদের এই সোনার বঙ্গে কর্মসংস্থান তৈরির জন্য।

—অঙ্কিত ঘোষ,
কলকাতা-৬।

ফঃ ৩

নিরামিষ আহার স্বাস্থ্যসম্মত সমাজ গড়ার অন্যতম

এই পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষের নয়— প্রত্যেকটি জীবের অধিকার রক্ষা করাই আমাদের নৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব। নিরামিষ আহার স্বাস্থ্যসম্মত সমাজ গঠনের অন্যতম পথ। বর্তমান সমাজে নিরামিষ আহারকে কেন্দ্র করে নানা বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। কিছু ব্যক্তি এটিকে 'নিরামিষ সাম্রাজ্যবাদ' বলে প্রচারের আলোয় তুলে ধরলেও, ইতিহাস, ধর্ম, নৈতিকতা ও বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে এটি শুধুমাত্র খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং মানব ও প্রাণী কল্যাণ, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং সামাজিক নৈতিকতার সঙ্গে সংযুক্ত একটি জীবনধারা। হিন্দু দর্শন এবং হিন্দুত্বের মূল নীতি অনুযায়ী অহিংসা পরম ধর্ম, তাই প্রাণী হত্যা ও নৃশংস খাদ্যাভ্যাস শিক্ষার্থীর চরিত্র, নৈতিকতা ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। গৌতম বুদ্ধের শিক্ষায়ও নিরামিষ আহার ও সর্বজীবের প্রতি করুণার গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উচিত এই নৃশংস প্রথা পরিহার করা এবং নিরামিষ আহারকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা। নিরামিষ আহার কেবল নৈতিক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি স্বাস্থ্যগত ও বিজ্ঞানভিত্তিক সুবিধার দিক থেকেও অপরিহার্য। বিভিন্ন গবেষণা প্রমাণ করে, স্যাচুরেটেড ফ্যাট কম থাকা, প্রোটিন, ভিটামিন, আয়রন, ওমেগা-৩ এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সঠিকভাবে গ্রহণ করা হলে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য ক্রনিক রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। নিরামিষ আহার মানসিক সতেজতা, মনোযোগ ও নৈতিক সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে, যা শিক্ষার্থী ও যুবসমাজের চরিত্র গঠনে অপরিহার্য। উদ্ভিদভিত্তিক খাবার যেমন ডাল, বাদাম, শস্য, সবজি এবং বিভিন্ন ফল শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করতে সক্ষম।

অন্যদিকে, মাংসাহারে কিছু স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বিদ্যমান। অতিরিক্ত মাংসভোগে স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পায়, যা হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও ওবেসিটির ঝুঁকি বাড়ায়। প্রক্রিয়াজাত মাংস ও অতিরিক্ত পশুপাখি উৎপন্ন খাদ্য দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। তাই নিরামিষ আহারকে বিজ্ঞানসম্মত, স্বাস্থ্যকর এবং নৈতিক বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

পরিবেশগত দিক থেকেও নিরামিষ আহার গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণী সম্পদের ওপর চাপ কমানো, জল ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা সম্ভব নিরামিষ আহারের মাধ্যমে। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক সংবেদনশীলতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করে। নিরামিষ আহার কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামূহিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

এই পৃথিবী শুধুমাত্র মানুষের নয়। প্রতিটি জীবের অধিকার রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। প্রাণীহত্যা শুধু নৃশংস নয়, এটি শিক্ষার্থীর চরিত্র ও নৈতিকতার জন্যও ক্ষতিকর। শিক্ষার্থী ও যুবসমাজের উচিত এই নৃশংস প্রথা বন্ধ করা, নিরামিষ আহারকে প্রচার করা এবং হিংসাহীন, নৈতিক ও যুবসমাজের উচিত এই নৃশংস প্রথা বন্ধ করা, নিরামিষ আহারের প্রচার করা এবং হিংসাহীন, নৈতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত সমাজ গঠনে ভূমিকা নেওয়া। সময় এসেছে এই সনাতনী বার্তাকে বাস্তবায়িত করার। নিরামিষ আহার গ্রহণ, প্রাণী হত্যা বন্ধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক নৈতিকতার বিকাশ— এই সব একত্রিত হয়ে হিংসাহীন, শিক্ষিত, নৈতিক এবং পরিবেশবান্ধব সমাজের ভিত্তি স্থাপন করবে। শিক্ষার্থী, যুবসমাজ এবং সমাজের প্রতিটি স্তরকে এখন সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। নিরামিষ আহারকে শুধুমাত্র খাদ্যাভ্যাস হিসেবে নয়, বরং নৈতিক সামাজিক, স্বাস্থ্যগত এবং পরিবেশবান্ধব জীবনধারার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা আজকের সময়ের সবচেয়ে জরুরি দাবি।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজরোড, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

বন্দেমাতরম্

ভাবতে অবাক লাকে যে, একটা শব্দ 'বন্দে মাতরম্' তার কী অসীম ক্ষমতা! এই একটিমাত্র ধ্বনি ইংরেজদের বুকের কাঁপুনি কীভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, অবশেষে তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম গানটি লেখেন ১৮৭৫ সালে এবং বঙ্গদর্শনে ছাপা হয়। পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে তাঁর অমর উপন্যাসে স্থান দেন। তারপর থেকে শুধু ইতিহাস। ১৯০৯ সালে এটি প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ 'Mother I bow to thee.' এই গানটি প্রথম সুর দেন মল্লার রাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীত গুরু যদুনাথ ভট্ট। পরে রবি ঠাকুর নিজেই সুর দেন দেশরাগে। ১৮৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই গানটি প্রথম গাওয়া হয়। ১৯০৫ সালে হীরালাল সেন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন যেখানে বন্দে মাতরম্ গান দিয়ে সমাপ্ত হয়। ১৯০৪ সালে ভগিনী নিবেদিতা জাতীয় পতাকায় প্রথম বন্দেমাতরম্ লেখেন। ২০০২ সালে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ৭০০০ গানের মধ্যে থেকে দুটো গান বেছে নেব, তার মধ্যে অন্যতম বন্দে মাতরম্। ১৯৫০ সালে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ গানটি 'জনগনমন' জাতীয় সংগীতের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় স্তোত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে হেমন্তের সুরে লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে যেটা আজ আমরা যাদুমন্ত্রের মতো শুনি। মা এবং দেশ, দেশ এবং মা অভিন্ন রূপে বন্দিত হয় দেশ বন্দনায়। মাতৃবন্দনার এমন রূপ পৃথিবীর আর কোনো দেশে পাওয়া যায় না। হাজার অ্যাটোম বোমার থেকে বেশি শক্তিশালী। উত্তরপ্রদেশে সরকার 'বন্দে মাতরম্' গানটি গাইতে স্কুল, কলেজে বাধ্যতামূলক করছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নিজে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ বিচারক। আইনের সঙ্গে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক। ঐতিহ্যবাহী কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা গত ১০ নভেম্বর তার পরম্পরা মেনে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গভীর টানের অনুভবে যা অনেক প্রশংসার দাবি করে।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

হিন্দু বিবাহ রীতিতে স্ত্রী-আচার

সমাপ্তি সামন্ত

হিন্দু সমাজে বিবাহ কেবল দুটি মানুষের মিলন নয়, বরং দুটি পরিবারের, দুটি গোত্রের, দুটি বংশের এক গভীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধনের সমন্বয়। এই বিবাহ প্রক্রিয়ায় স্ত্রী সংক্রান্ত বিভিন্ন আচারগুলি প্রভূত গুরুত্ব বহন করে। প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ ও লোকসংস্কৃতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এইসব স্ত্রী আচার। যা নবদম্পতির জীবনকে সুখী ও মঙ্গলময় করে তুলতে সাহায্য করে। এই বিশ্বাস আমাদের সকলের মনে দৃঢ়মূল।

আইবুড়ো ভাত : এই স্ত্রী আচারটি সাধারণত বিবাহের আগে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পরিবার কন্যাকে তার পছন্দের সর্বোত্তম খাবার পরিবেশন করে অতি যত্ন সহকারে। এটি অবিবাহিত জীবনের প্রতি এক স্নেহপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং নতুন জীবনের শুভাশিস। আইবুড়ো ভাত স্ত্রী আচারের মধ্য দিয়ে পরিবার কন্যার প্রতি তাদের আবেগ, স্নেহ ও যত্নের প্রকাশ ঘটায়। পরিবার ও সমাজের আশীর্বাদ নিয়ে কন্যা নতুন জীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি নেয়।

বর-কনের গায়ে হলুদ : বিভিন্ন স্ত্রী আচারগুলির মধ্যে অন্যতম হলো এই গায়ে হলুদ। এটি সাধারণত বিবাহের দিন সকালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কনে ও বর উভয়ের শরীরে হলুদ, দুধ ও তেলের মিশ্রণ লাগানো হয়। হলুদকে পবিত্র ও জীবাণুনাশক হিসেবে ধরা হয়। তাই এটি সৌন্দর্য বর্ধন ও মঙ্গল লাভের প্রতীক। কন্যাকে শ্রীরূপে রূপসী করে তুলতে এবং বরকে শক্তি ও সুরক্ষা দিতে এই আচার সম্পাদিত হয়। সমাজের নারীরা বিশেষত বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারা এই আচার সম্পন্ন করেন, যা নারী সমাজের আশীর্বাদ ও আবেগময় সম্পর্ককে তুলে ধরে। এই স্ত্রী আচারটি কন্যাকে তার নতুন সংসারের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলে।

কন্যাদান : হিন্দু বিবাহের মূল স্তম্ভ হলো কন্যাদান। কন্যাদানের মাধ্যমে পিতা-মাতা কন্যাকে সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে বরকে সমর্পণ করেন। তিনি যেন কন্যাকে সুখ, সম্মান ও সুরক্ষা প্রদান করেন। শাস্ত্রমতে কন্যা দান-কে সমস্ত দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান বলা হয়েছে। এই স্ত্রী আচার নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও বৈবাহিক সংসারে তার স্থানকে আরও শক্তিশালী করে।

মালাবদল ও পাণিগ্রহণ : মালাবদল হিন্দু বিবাহ রীতিতে বিভিন্ন স্ত্রী আচারের মধ্যে অন্যতম। মালা বদলকে কেন্দ্র করে অনেক মজাদার ঘটনার সম্মুখীন হই আমরা। বর-কনে পরস্পরকে মালা পরানোর মধ্য দিয়ে সমানতায় উভয়ের গ্রহণযোগ্যতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। নারীর সম্মান, স্বাধীনতা ও পছন্দের প্রতি এই আচার একটি সুন্দর ইঙ্গিত বহন করে। মালাবদলকে কেন্দ্র করে কনে পক্ষের নাপিত বিভিন্ন রকমের হাস্যরসাত্মক, আশীর্বাদ মূলক, মজাদার ছড়া পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই স্ত্রী আচারটিকে আরও প্রাণোজ্জ্বল করে তোলে।

পাণিগ্রহণে বর কনের হাত ধরে অগ্নির সামনে প্রতিজ্ঞা করেন তিনি কনেকে রক্ষা করবেন, সম্মান দেবেন এবং আজীবন পাশে থাকবেন। এটি নারীর প্রতি সমগ্র সমাজের অঙ্গীকারের এক প্রতীকী রূপ।

সপ্তপদী বা সাতপাক : অগ্নির সম্মুখে সাতপাক বা সপ্তপদী সম্পূর্ণ হলে বিবাহ শাস্ত্রীয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রতিটি পাকে বরকণে সাতটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে ।

১. খাদ্য ও জীবিকা অর্জন, ২. শক্তি ও সহনশীলতা, ৩. সম্পদ ও সমৃদ্ধি, ৪. সুখে-দুঃখে সহযাত্রী হওয়া, ৫. পরিবার গঠন, ৬. দীর্ঘ জীবন ও শান্তি, ৭. বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা।

এই সাত পদক্ষেপ দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি মূল স্থাপন করে। এটি স্ত্রীধর্ম ও দাম্পত্যের চিরন্তন বন্ধনের মূল ভিত্তি।

সিঁদুর দান : হিন্দু বিবাহের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ স্ত্রী আচার হলো সিঁদুর দান। বর কনের সিঁথিতে পরিয়ে তাকে বৈবাহিক মর্যাদা প্রদান করে। সিঁদুরকে দীর্ঘায়ু, সুখ-সমৃদ্ধি ও স্বামীর মঙ্গল কামনার প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। সিঁদুর কেবল একটি আচার নয়, এটি হিন্দু সমাজে স্ত্রী পরিচয়ের ঐতিহ্য বহন করে।

লাজা হোম : ভ্রাতৃস্নেহ ও গৃহস্থ জীবনের প্রতিজ্ঞা।

লাজা হোমে কনেকে তার ভ্রাতৃবর্গ খই বা লাজা হাতে দেয়, যা বর অগ্নিতে আহুতি দেয়। এর মাধ্যমে স্ত্রী-ধর্ম পালনে এবং সংসারে বর ও কনে একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। লাজা হোম কনেকে তার পরিবার থেকে নতুন সংসারে যাত্রার সেতুবন্ধন তৈরি করতে সাহায্য করে।

বাসর রাত : বিবাহিত জীবনের সূচনা।

বিবাহের বিভিন্ন আচার শেষে নবদম্পতির প্রথম অন্তরঙ্গ সময়ের আয়োজন। এই সময় চুপিসারে পারস্পরিক পরিচয় পর্ব সেরে নেয় তারা। অল্প হলেও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে নব দম্পতি।

বউভাত : স্ত্রীকে নতুন সংসারে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ। এই স্ত্রী আচারটি পালন করা হয় কনের শ্বশুরবাড়িতে। বিবাহ পরবর্তী দিন শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই আচারটি পালন করা হয়। নতুন বউকে ঘরের বিভিন্ন সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। নতুন পরিবারে তার স্থান প্রতিষ্ঠা পায়। এটি স্ত্রী আচারগুলির সমাপনী পর্ব। যেখানে সমাজ স্ত্রীকে নতুন সংসারের পূর্ণ সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। হিন্দু বিবাহ রীতিতে এই স্ত্রী আচারগুলি কেবলমাত্র ধর্মীয় রীতি নয় বরং নারীর জীবন পথে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বাহক হিসেবে কাজ করে। এগুলির মধ্য দিয়ে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তার আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন সংসারে তার প্রতিষ্ঠা ও পারিবারিক সম্পর্কের সৌন্দর্যকে রক্ষা করে এই আচারগুলি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই স্ত্রী আচারগুলি হিন্দু বিবাহ রীতিকে সতেজ ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে। এই আচারগুলি ছাড়া হিন্দু বিবাহ রীতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। □

সুস্থ জীবন ধরে রাখার কয়েকটি উপায়

রিংকী ব্যানার্জী

শর্করাজাতীয় খাবার এড়ানো খুবই কঠিন, সেগুলোর ভেতর চিনি আছে, আছে শ্বেতসার আর আঁশ, যা ফল, দুগ্ধ, শস্য বা সবজির ভেতরেও পাওয়া যায়। অনেক সময়ই আমরা শর্করা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে যাই, সেটা আসলে কীভাবে আমাদের শরীরের জন্য কাজ করে। শরীর ঠিক রাখতে শর্করা নিয়ে কয়েকটি উপায় তুলে ধরা হলো।

সব শর্করাই খারাপ নয় : আমাদের শরীর যেসব খাবার থেকে শক্তি সঞ্চয় করে, তার একটি হলো শর্করাজাতীয় খাবার, যার মধ্যে রয়েছে স্টার্চ বা শ্বেতসার, চিনি ও আঁশ। আলু, আটা, চাল ও পাস্তার মধ্যে অনেক শ্বেতসারজাতীয় শর্করা রয়েছে। কোমল পানীয়, মিষ্টি, প্রক্রিয়াজাত খাবারের ভেতর রয়েছে চিনি। শ্বেতসার ও চিনি, উভয়েই শরীরের ভেতর চিনি গ্লুকোজে পরিণত হয় তা শক্তি উৎপাদন করে অথবা চর্বিতে পরিণত হয়। তবে আরেকটি শর্করা রয়েছে, যাকে বলা হয় পথ্যজাতীয় আঁশ খাবার। ফল ও সবজির ভেতর আঁশ রয়েছে। এ ধরনের শর্করা ধীরে ধীরে শক্তি নির্গত করে, যা আমাদের পাকস্থলীর জন্য খুবই ভালো, তা শেষপর্যন্ত সেটি শরীরের ভেতর গিয়ে চর্বিতে পরিণত হয় না।

খারাপ শর্করাও ভালো শর্করায় পরিণত হতে পারে : বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, রান্না করা এবং ঠাণ্ডা করার ফলে খারাপ শর্করা অনেক সময় ভালো শর্করায় পরিণত হয়ে যায়। খারাপ শর্করা সহজেই গলে গিয়ে চিনিতে পরিণত হয় এবং দ্রুত শরীরের সঙ্গে মিশে যায়, যা ওজন বাড়াতে বড়ো ভূমিকা রাখে। কিন্তু ভালো শর্করা মিশে যায় না। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে সেটি পাকস্থলীতে জমা হয়, যা দেখে আনন্দিত হয় সেখানকার ব্যাকটেরিয়া।

পাউরুটি খাওয়া ততটা খারাপ নয় : অনেক বছর ধরে পাউরুটির বিরুদ্ধে নানা কথা বলা হলেও খাবারটি ততটা খারাপ নয়। তবে আরও ভালো হবে যদি সাদা রঙের পাউরুটির বদলে কালচে ধরনের রুটি খেতে শুরু করেন। সাধারণত যেসব পাউরুটি তৈরি করা হয়, সেগুলো সহজেই হজম হয়ে যায়। ফলে শরীরে গ্লুকোজ হিসেবে জমা হওয়ার বদলে আগেই অন্যান্য অংশে মিশে যায়। তবে পূর্ণ গমের তৈরি পাউরুটি বা রুটিতে প্রতিরোধী শ্বেতসার থাকে, যার ফলে আপনার শরীরের অনেক অন্ত্রের ভেতর দিয়ে সেটি যাতায়াত করে। পাউরুটি কেনার সময় চিনির পরিমাণটা দেখে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পূর্ণ গমের অনেক পাঁউরুটিতে স্বাদ বাড়ানোর জন্য চিনি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পরিশোধিত শর্করা ডায়াবেটিস রোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে : খারাপ শর্করায় চিনি বেশি থাকে, যা পরিমাণে বেশি হলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করে। সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসকরা দেখতে পেয়েছেন, রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণে অনেক ডায়াবেটিক রোগী আছেন, অর্থাৎ প্রতি ১০ জনে একজনের এই রোগটি আছে। এদের মধ্যে ৯০ শতাংশের টাইপ-টু ডায়াবেটিস, যাদের বেশিরভাগের অতিরিক্ত ওজন রয়েছে। ডায়াবেটিককে 'নীরব ঘাতক' বলা হয়। কারণ, অনেক মানুষের এই রোগের কোনো লক্ষণ থাকে না। অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরে অশনাক্ত থাকে অথবা এমন সময় ধরা পড়ে, যখন সেটি খুব খারাপ কোনো পর্যায়ে চলে গেছে। এ জন্য অনেক চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা খারাপ খাবারকে দায়ী করলে যেমন অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করাযুক্ত খাবার খাওয়া, যা টাইপ টু ডায়াবেটিস বাড়িয়ে দেয়। বরং স্বাস্থ্যকর ও সঠিক খাবার খেয়ে মানুষজন তাদের ডায়াবেটিক রোগটি অনেকাংশে ঠেকাতে পারে।

কম শর্করাযুক্ত খাবার ডায়াবেটিস-২ প্রতিরোধ করে : সাধারণ নিয়ম হলো আপনার প্লেটের খাবারের রঙের দিকে তাকান। বাদামি ও সাদা খাবার বাদ দিন, সবুজ খাবার বাড়িয়ে দিন। গবেষণা বলছে, খারাপ শর্করা দূর করতে পারলে রক্তে গ্লুকোজের গড় পরিমাণ অনেক কমিয়ে আনতে পারে। রক্তে বেশি চিনি থাকার পরিণাম হলো- আপনার ডায়াবেটিস ঝুঁকির পরিমাণও অনেক বেড়ে যাওয়া।

খারাপ শর্করা সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে : শরীরের শক্তির জন্য শর্করার দরকার আছে, কিন্তু তা হতে হবে সঠিক পরিমাণে। গবেষক গ্রেস ডজডেল নারী ও পুরুষের ওপর একটি গবেষণা চালিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন, সন্তান জন্মদানে অক্ষমতার পেছনে আসলে ঠিক কী কাজ করে? তিনি বলছেন, নতুন একজন মানুষকে পৃথিবীতে আনার বিষয়টি অনেক শক্তির একটি প্রক্রিয়া, একটি মানুষের জন্ম হয়, ডিম্বানু ও ভ্রূণের নিষিক্তর প্রয়োজন হয়, আর এসব কিছুর পিছনে দরকার হয় ভালো শক্তি। আপনি যদি খারাপ ধরনের খাবার খেয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো সন্তান জন্ম দেওয়া আপনার জন্য অনেক কঠিন হয়ে উঠবে। যখন কোনো যুগল সন্তান নিতে চান, ডজডেলের পরামর্শ হলো, কম শর্করাযুক্ত খাবার খাওয়া। নারীদের পুরো গর্ভধারণের সময় স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও এটি সহায়তা করে।

খারাপ শর্করা সন্তানদের মধ্যেও ছড়িয়ে যেতে পারে : খারাপ জীবনযাপনের প্রভাব পড়তে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর। জিনবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানীদের বেশ কয়েকটি গবেষণা বলছে, খারাপ খাবারের কারণে কারণে কারও জিনের গঠন পালটে যেতে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি বেশি ঘটে। সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে আলোচনায় সাধারণত মায়ের স্বাস্থ্য নিয়েই কথা বলা হয়, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত মোটা মানুষের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে তাদের জিনের ক্ষতি হচ্ছে। অর্থাৎ সন্তান নেওয়ার আগে তাদের জীবনযাপনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের জিনের পরিবর্তন ভ্রূণ মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়াতে পারে। ফলে তাদের সন্তান কোনো রোগ নিয়ে জন্মায় বা ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে পারে। □

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত
উত্তোলিত হলো ধর্মধ্বজ

২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার, সকাল ১১টা বেজে ৪৮ মিনিটে উত্তোলিত হলো অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের চূড়ায় গৈরিকধ্বজ। ধ্বজোত্তোলন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এই ধ্বজোত্তোলনের সাক্ষী থাকতে ছিল লক্ষ মানুষের ভিড়। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, উপস্থিত ছিলেন ৭ হাজার বিশিষ্ট অতিথি।

সমাপ্ত হয়েছে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের নির্মাণ কাজ। মূলত সেই কারণেই এই শুভ মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতিথির অভিজিৎ মুহূর্ত অর্থাৎ শ্রীরাম ও সীতামাতার বিবাহ তিথিতে শ্রীরামমন্দিরের ১৯১ ফুট উঁচু শিখরে ধ্বজ উত্তোলিত হলো। পবিত্র ধ্বজটি রঘুবংশের ধর্মধ্বজ, যা ২২ ফুট লম্বা ও ১১ ফুট চওড়া। তাতে রয়েছে মিশ্র বৃক্ষ কোবিদার (বাংলায় কৈরাল/কৈরালো বৃক্ষ, যা ছিল অযোধ্যার রাজবৃক্ষ। মহর্ষি কাশ্যপ পারিজাত ও মন্দার বৃক্ষের সংমিশ্রণে এই বৃক্ষ প্রস্তুত করেন), ওঙ্কার চিহ্ন ও সূর্যবংশের প্রতীক পূর্ণসূর্যের চিত্র। প্রধানমন্ত্রীর চোখে এই অনুষ্ঠান সাধারণ নয়। তিনি এই অনুষ্ঠান ও ধ্বজোত্তোলনকে ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের প্রতীক বলে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, পাঁচশো বছরের অপেক্ষার অবসান হলো আজ।

সরসঙ্ঘচালক শ্রীমোহনরাও ভাগবত বলেন, শতাব্দীপ্রচীন স্বপ্ন, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বাস্তব রূপ আজ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করলেন। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরের পুনর্নির্মাণের জন্য বিগত পাঁচশো বছরে যাঁরা নিজেদের জীবন, শ্রম ও সময় উৎসর্গ করেছেন তাঁদের আত্মা আজ শান্তি পেল। আজ শ্রীরামমন্দিরের চূড়ায় যে ধ্বজ উত্তোলিত হলো তা ধর্মধ্বজ। চিরকাল এই ধ্বজ সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখাবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদী বলেন, শ্রীরামমন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে এই পবিত্র ধ্বজোত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীপ্রাচীন ক্ষতে প্রলেপ পড়ল। ২০৪৭ সালের মধ্যেই বিকশিত ভারত নির্মাণ সম্পন্ন হবে। আজকের অযোধ্যা মানবতার উন্নয়নের মডেল হয়ে উঠেছে। কোটি কোটি মানুষের আগমনের ফলে স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে। ভারত খুব শীঘ্রই উন্নতির শিখরে উঠবে।

ব্রিগেডে পাঁচলক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ উপলক্ষ্যে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের সাংবাদিক সম্মেলন

আগামী ৭ ডিসেম্বর কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পাঁচলক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ উপলক্ষ্যে গত ২৬ নভেম্বর কলকাতায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড-স্থিত ‘পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ আয়োজন কেন্দ্রীয় সমিতি’র কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। গীতাপাঠ আয়োজন সমিতির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, সম্পাদক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী ।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী জানান, ২০২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর ব্রিগেডে এক লক্ষ কণ্ঠে সমবেত গীতাপাঠ বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে। ওই অনুষ্ঠানে ১৩০০ সাধু মহাত্মা-সহ ১ লক্ষ ৪৫ হাজার জন ভক্ত গীতাপাঠে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানান, আগামী ১ ডিসেম্বর বিধিসম্মতভাবে ভূমিপূজন করে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এবার ১ ডিসেম্বর গীতাজয়ন্তীর ৫১৬২তম বর্ষ, তাই সেদিন কলকাতা গঙ্গার দইঘাট থেকে ১০০৮টি গঙ্গাজলপূর্ণ কলস-সহ শোভাযাত্রা করে নিয়ে এসে সেই জলকে পূজা করা হবে। ৭ ডিসেম্বর কাল ৯টায় মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে। মাঠে গেটের শুরু থেকে শোভাযাত্রার মাধ্যমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একটি রথের উপর রেখে কীর্তন ও পুষ্পবর্ষণ করে মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করা হবে। মঞ্চে শুধুমাত্র ২০০০ জন সাধুসন্তের বসার ব্যবস্থা থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অসম, ত্রিপুরা ও দিল্লি থেকে সাধুসন্তরা আসবেন বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংকল্পমন্ত্র পাঠ করানো হবে। সনাতন ধর্ম রক্ষার্থে সংকল্প গ্রহণ করা হবে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য মন্ত্রীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে। রাষ্ট্রপতি মহোদয়াকে ইতিমধ্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ। সাধ্বী ঋতম্ভরা, বাগেশ্বর ধামের পূজ্য ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী মহারাজ এবং যোগগুরু বাবা রামদেব জী মহারাজের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সঙ্ঘ-শক্তি তৃণভূমে : ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ

বিদ্যুৎ মুখার্জি ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন দ্বাপর ও কলিযুগের সংযোগস্থলে। এই দ্বাপরযুগের বাণীই কলিযুগের পথ। এই বাণীতেই পাপপ্রবর্তকের রাজ্যকাল, সামাজিক অবনতি এবং আধ্যাত্মিক অধোগতি দূর হবে। দূর হবে রাজ্যের গ্রহের দশা। এই বাণী নিয়ে আসবে সত্যযুগের মহালয়া ও আগমনীবার্তা। যা সত্য, যা সুন্দর, যা শাশ্বত, যা চিরায়ত, তা সত্যযুগের আগমনে ঘটবেই। গীতাধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রচারেই তা সুসম্পন্ন হবে।

৭ ডিসেম্বর দিনটিতে যথার্থ ভাবেই 'হিন্দু মিলন মন্দির'; দেবালয় এদিন নেমে আসবে ভূমিভাগে; এ আমার পিতৃ-পিতামহের ভূমি; এ আমার ভূমি রক্ষার লড়াই। এজন্যই লড়াই করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তাঁরই আদর্শ সন্ন্যাসী স্বামী প্রণবানন্দ, যিনি 'হিন্দুরক্ষী দল' গঠনের চিন্তন করেছিলেন। ফুল্লকুসুমিত হয়ে এদিন সেই হিন্দুশক্তিরই পল্লবিত হওয়ার পালা। হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাকার পালা। লক্ষ ছাপিয়ে কবে কোটি কণ্ঠে গীত হবে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদ, প্রতীক্ষা করে আছেন হিমালয়ের গুহা কন্দরের প্রাচীন সাধু-সন্ন্যাসীরাও।

২০২৫ সালে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের শেষপাতায় রয়েছে এক অনবদ্য চ্যালেঞ্জ। গ্রহণ করেছে সনাতনী শক্তির সৌকর্য। কলকাতার বিগ্রেড প্যারেড ময়দানে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ হবে। ৭ ডিসেম্বরে ধার্য দিনটি নিছক আর পাঁচটি দিনের মতো নয়! আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতেই উপযুক্ত স্থানে কোটি কণ্ঠে গীতাপাঠ হবে। বিশ্বজুড়ে বিবিধ স্থানে যুগপৎ গীতাপাঠের আসর তো এখনই বসতে পারে! পাঁচ কোটি কণ্ঠে পাঠ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। শতকণ্ঠ, লক্ষকণ্ঠ ছাপিয়ে চক্রপাণি-ভক্তের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। সমবেত গীতাপাঠের মাধ্যমে কী বার্তা প্রেরণ করছে সনাতনী সমাজ? ধর্ম-সংহতির পুনরুত্থান পর্বে কেনই-বা গীতাপাঠকে বেছে নিচ্ছেন তাঁরা? কেনই-বা তুলসী মাহাত্ম্য বর্ণনা, তুলসীপূজন? কেন দিকে দিকে গঙ্গারতির আয়োজন? কেন গো-সেবা, গো-ভিত্তিক জৈবচাষের পুনর্মূল্যায়ন? দফা এক, দাবি এক— 'রামরাজ্য' সুসংবাদ। রাজ্য ও রাষ্ট্র পরিচালনায় হাত মেলাবেন রাজর্ষি। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ থাকবে সর্বোপরি।

দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত অমোঘ বাণী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় জীবন দর্শন, তা সম্পূর্ণভাবে আদর্শ মানব জীবন পদ্ধতি, তা আধুনিক যুগে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার উপযুক্ত পাঠক্রম। গীতার শিক্ষা হচ্ছে জীবনচর্যার শিক্ষা, মানসচর্চার শিক্ষা। শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী 'গীতার ধর্ম' প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বলছেন, "রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কর্তব্য বলিতেছে, 'যুদ্ধ কর'। পারিবারিক কর্তব্য দাবি করিতেছে, পিতামহ, গুরু, আত্মীয়-স্বজনকে মারা উচিত নহে।... সমস্যা এই--- কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ। একটা কর্তব্য পালন করিতে গেলে, অন্যটা সম্ভব হয় না।... সমস্যা এই— কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ। একটা কর্তব্য পালন করিতে গেলে, অন্যটা সম্ভব হয় না।... জীবনে সকলেরই সমস্যা এই— অর্থ উপার্জন করিতে যে ভয়ানক খাটুনি, তাহাতে শরীর থাকে না, আবার শরীর রাখিতে গেলে অর্থাভাবে না খাইয়া মরিতে হয়। বিদ্যালাভের যোগ্যতা ছিল কিন্তু সংসারের প্রয়োজন মিটাইতে বিদ্যালাভ হইল না। শ্রীরামচন্দ্রের সমস্যা— প্রজারঞ্জন করিতে গেলে স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করিতে হয়, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করিতে গেলে প্রজারঞ্জন হয় না। স্বাধীনতা লাভ করিতে গেলে ভারত দ্বিখণ্ডিত করিতে হয়, দেশের অখণ্ডতা রাখিতে গেলে স্বাধীনতা লাভ হয় না। সর্বত্রই এই দ্বন্দ্ব। কীসে আমাদের কল্যাণ, তা বুঝিতে না পারিয়া জীবন হয় সমস্যাসঙ্কুল ও বিষাদময়।"

ঠিক এই জায়গায় পৌঁছে আমরা গীতার শরণ নিই। মহানামব্রতজীর অনুভবে গীতার আঠারোটি অধ্যায় যেন আঠারোটি সিঁড়ি; বিষাদ থেকে মোক্ষে উত্তীর্ণ হবার সিঁড়ি, গীতা-মায়ের শান্তিময় ক্রোড়ে পৌঁছানোর সিঁড়ি। মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ গীতার লক্ষ্য নয়, জীবনেই মোক্ষের অবস্থালাভ আদর্শ। জীবনে যিনি মুক্তি পেয়েছেন, পরলোকে তিনি তো মুক্তি পাবেনই।

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক। তার পরতে পরতে ব্যাখ্যাত হয়েছে চরম ও গুহ্যতম জ্ঞান। গীতায় যে ধর্মনীতি প্রচারিত— সব

ধর্মনীতি সেই নীতির অন্তর্নিহিত ও প্রতিষ্ঠিত। গীতায় যে কর্মপন্থা প্রদর্শিত— সেই কর্মপন্থা উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ। এমনই মন্তব্য করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। বঙ্গপর্বের সময় গীতা বিষয়ক তাঁর একটি প্রবন্ধ রচনা আছে। তখন তিনি সাপ্তাহিক 'ধর্ম্ম' পত্রিকার সম্পাদক। প্রবন্ধের প্রস্তাবনা ছিল তিনটি ভাগ— বক্তা, পাত্র ও অবস্থা। বক্তা শ্রীকৃষ্ণ; তিনি কর্মবীর, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধা; ক্ষত্রিয়দেহে ব্রহ্মজ্ঞানী হিসেবে প্রদর্শিত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; মানবদেহে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম গ্রহণ করে লীলা করেছেন। 'পাত্র' হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ-সখা মহাবীর অর্জুন। তিনি গীতারূপ জ্ঞানের পাত্র, প্রিয় সখা, পরম হিতৈষী বন্ধু ও ভগ্নীপতি। ভগবান তাঁকে গীতার পরম রহস্যের অমৃতবাণী শোনার জন্য বরণ করে নিয়েছেন। সখা ও সহায় যিনি, তাঁর থেকে জ্ঞানলাভ করে অর্জুন মানবজাতিকে তা তুলে দিলেন। 'অবস্থা' অংশটি হলো কুরুক্ষেত্রের অতি-ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রারম্ভ। গীতোক্তির উদ্দেশ্য বুঝতে গেলে এই কনটেক্সট জানা দরকার। কোন অবস্থায়, কোনো পরিস্থিতিতে সেই জীবন-নাট্য সংঘটিত হচ্ছে। স্থান যুদ্ধক্ষেত্র হলেও, মঞ্চ সৈন্যদ্বয়ের মধ্যস্থল হলেও সেখানে দীপ্ত-কথাচারণা। ভগবান কী, জগৎ কী, সংসার কী, ধর্মপথ কী, সব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর রয়েছে সেখানে। সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কর্মশিক্ষাই গীতার উদ্দেশ্য। 'গীতা অক্ষয় মণির আকর।' যুগে যুগে আকরস্থ মণি সংগ্রহ করলেও উত্তরসূরী পুনরায় অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করবেন। সম্পদ আহরণের অবধি নেই।

কলিযুগে গীতার বাণী সর্বোৎকৃষ্ট একারণেই, এই যুগে বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। কালের ধারায় জীর্ণ পুরাতন ধ্বংস করে নতুনের আবির্ভাব ঘটাই। কলিকাল হচ্ছে নবায়নের কাল। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, কলিকাল নতুন বীজ বপনের কাল, অঙ্কুরোদগমের কাল। বীজ থেকে মহীরুহ হয় সত্যযুগের বৃক্ষ। অবনতির পরে চক্রগতির উন্নতি হবে। ভগবানের আপন অভিসন্ধি সাধিত হবে।

(ফাইল চিত্র)

গীতার প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তির বিষয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই সঞ্জয়ের কাছে যুদ্ধের খবর নিচ্ছেন। ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোকের চোখে তা কবির কল্পনা মনে হতে পারে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, 'যদি বলিতাম অমুক লোক দূরদৃষ্টি (Clairvoyance) ও দূরশ্রবণ (Clairaudience) প্রাপ্ত হইয়া দূরস্থ রণক্ষেত্রের লোমহর্ষক দৃশ্য ও মহারথীগণের সিংহনাদ ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধহয় কথাটি তত অবিশ্বাস্যযোগ্য না-ও হইতে পারিত।' বলেছেন, 'যদি বলিতাম যে একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ অমুক লোককে স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত (Hypnotised) করিয়া তাঁহার মুখে সেই দূর ঘটনার কতক বর্ণনা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা হইলেই যাঁহারা পাশ্চাত্য hypnotism-এর কথা মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেও পারিতেন।' জানা যায় সূক্ষ্মদৃষ্টির চরম পরিণাম হলো 'দিব্যচক্ষু'। মনীষীদের উপলব্ধিতে মহাভারত রূপক নয়, কৃষ্ণ ও অর্জুনও কবির কল্পনা নয়।

সমাজে একটি প্রচলিত 'মিথ' এই, স্বামী বিবেকানন্দ গীতাগ্রন্থ এবং গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেলাকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনেককে বলতে শোনা যায়, তিনি গীতাপাঠের বিরুদ্ধে ছিলেন। 'গীতা পড়ার চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হবে।' স্বামীজী যে পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্যটি করছেন, তার সঙ্গে এটিও বলেছিলেন, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হলে তোমরা গীতা আরও ভালো বুঝবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হলে শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভালো করে বুঝবে। স্বামীজী গীতাপাঠের বিরোধিতা করেননি। তাঁর নানান লেখায়, নানান বক্তব্যে, কথোপকথনে, চিঠিপত্রে অসংখ্যবার গীতা প্রসঙ্গের অবতারণা এসেছে। তাঁর গীতা অনুধ্যান যথেষ্ট সাহসী ও সদর্থক।

স্বামীজী ১৯০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে 'কৃষ্ণ ও তাঁর শিক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন, সে যুগের মতো ঘটনা এ যুগেও ঘটতে দেখা যায়। মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে শেখানোই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি। বলেছেন, তিনি যত মানুষের কথা জানেন, তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার, হৃদয়বত্তা— সব দিন থেকেই তিনি মহান। বিমর্ষ অর্জুনের অস্ত্রত্যাগ থেকে গীতার আরম্ভ। স্বামীজী বলছেন, গীতার মধ্যে যে শিক্ষা, সমগ্র মহাভারতের মধ্যেও সেই শিক্ষা। গীতা না পড়লে কৃষ্ণচরিত্র কখনোই বোঝা যাবে না; কারণ গীতার প্রচারক তাঁর

নিজের উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন, ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহ তিনি। অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত তিনি। অনেককে রাজা করলেন, নিজে রাজা হলেন না। স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত ভারতের নেতা বলেছেন, যাঁর কথায় রাজারা নিজেদের সিংহাসন ছেড়ে দেয়, অথচ তিনি রাজা হন না। স্বামজীর মনে হয়েছে কৃষ্ণের জীবনচরিতে, অনেক ঐতিহাসিক অমিল আছে, হয়তো অনেক বিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্ম এবং নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব জগতে অভিনব।

স্বামীজী বলছেন, সমন্বয় ভাব এবং নিষ্কাম কর্মই গীতার বিশেষত্ব। গীতার নতুনত্ব হচ্ছে তার সামঞ্জস্যের প্রচেষ্টার মধ্যে। যোগ, জ্ঞান, ভক্তি পূর্বে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সবগুলির মধ্যে পাস্পরিক বিবাদ লক্ষ্য করা যেত। গীতাকার তার মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা করলেন। সমকালীন সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়ে যাওয়া উত্তমকে গ্রহণ করলেন। গীতার নিষ্কাম কর্মের কথা একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নিষ্কাম কর্মের সঠিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিষ্কাম হওয়া মানে উদ্দেশ্যহীন হওয়া নয়। যদি অর্থ এমনটাই হতো, তবে হৃদয়শূন্য পশুরা এবং দেওয়ালগুলেকেও নিষ্কাম কর্মী বলা যেত। নিষ্কাম কর্মীরা হৃদয়শূন্য ও জড় প্রকৃতির হতে পারেন না। ভালোবাসায়, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হবে নিষ্কাম কর্মী; জগৎকে প্রেমের সঙ্গে আলিঙ্গন হবে তাঁর স্বভাব।

স্বামীজী 'ভয়'-কে 'পাপ' বলছেন। যে কাজে শক্তির উদ্রেক ঘটে তাই 'পুণ্য'। তাই তিনি দুর্বলতা পরিত্যাগ করতে বলেছেন। গীতায় আছে, 'ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ'। তিনি অর্জুনকে সম্মানে হানিকর ক্লীবত্বের বশবর্তী হতে বারণ করছেন। হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াতে উপদেশ দিচ্ছেন। স্বামীজীর মতে অর্জুনের সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হয়ে যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হয়নি। তমোগুণ থেকেই যুদ্ধে অনিচ্ছা ছিল। 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'— এই অজুহাতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কাপুরুষ ও কপট বললেন। স্নেহ-ভালোবাসাবশত দেশের ও রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলে গেলে চলবে না। 'পণ্ডিতের মতো কথা বলিতেছ অথচ কাপুরুষের মতো কাজ করিতেছ; ওঠ, দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।' স্বামীজীর মতে এটাই কর্মযোগের প্রধান ভাব, শক্তির উচ্চতম বিকাশ। কাজ করতে গেলে সংগ্রাম করতে হয়, নতুন উদ্যমে সাধ্যমতো আঘাত করতে হয়। প্রতিকার শক্তি যার আয়ত্তে আছে, তার পক্ষেই ধর্ম বিবেচ্য।

সত্ত্বগুণীদের স্বভাব হচ্ছে অন্য মুহূর্তে যেমন শান্ত, বিপদে তেমনই ধীর। অর্জুন যুদ্ধ করতেই এসেছিলেন। পরে বিপক্ষে প্রচুর সৈন্যব্যূহ সাজানো দেখে তার মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটে। সত্ত্ব ও তমোগুণ কিছুটা একরকম দেখালেও তাদের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। তমোগুণ সত্ত্বগুণের পোশাক পরে আসতে পারে। অর্জুনের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল, দয়ারূপ আবরণে উপস্থিত হয়েছিল।

ভগবান নিজেও কর্মত্যাগী নন। তিনি অনাসক্ত হয়ে কাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'হে অর্জুন আমাকেই দেখ না, আমি যদি এক মুহূর্ত কর্ম থেকে বিরত হই, সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। কর্ম করে আমার কোনো লাভ নেই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভু, তবে আমি কর্ম করি কেন? জগৎকে ভালোবাসি বলে।'

আমরা রোজ গীতা পড়েও অর্থ উপলব্ধি করতে পারবো না, যদি না স্বামীজীর কথামতো গীতার 'ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ' কথাটি পালন না করি এবং জগতকেও রোজ শোনাতে না বলি। স্বামীজী তো গীতার পথ অবলম্বন করে আমাদের সর্বশক্তিমান হতে বলেছেন, ভয় না করে তোপের মুখে এগিয়ে যেতে বলেছেন। তাই পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা স্বামীজীর উপদেশ, বাণী ও ছবি সঙ্গে রাখতেন। আজও তো আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক লড়াই চালাতে হবে, নতুবা সনাতনী সংস্কৃতির সৌকর্য বজায় রাখা যাবে না। তাই স্বামীজীর গীতা বিষয়ক সত্যিকথাগুলি মেনে চলতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১. বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র, অখণ্ড বাংলা সংস্করণ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২১তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩। ২. শ্রীঅরবিন্দের গীতা অনুধ্যান, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, Hindu Voice, 23 December, 2023। ৩. শিষ্য সামীপ্যে গীতা প্রসঙ্গে স্বামীজী। দুই গ্রন্থের নিবিড় পাঠ, মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ চক্রবর্তী (Facebook Post 11 December 2024, Tilak Sengupra)। ৪. স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, উদ্বোধন, জুন, ২০১৭, ৩৩তম পুনর্মুদ্রণ। ৫. স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, ভগিনী নিবেদিতা, উদ্বোধন, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ পুনর্মুদ্রণ। □

ফ ঃ ৪

লোকপ্রজ্ঞা কাঁথি চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে 'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

লোকপ্রজ্ঞা কাঁথি চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৩ নভেম্বর কাঁথি শহরের কালিকাপুর 'দেশপ্রাণ অনুষ্ঠান ভবন'-এ দেশমাতৃকার বন্দনাগীতি তথা জাতীয় মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' রচনার সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিত কুমার দে। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কাঁথি হাই স্কুলের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ডঃ বাণেশ্বর দাস এবং মুখ্য বক্তারূপে ছিলেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাশ। ছাত্র-ছাত্রী, মাতৃমণ্ডলী ও বিশিষ্ট জন-সহ ৭০ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং ভারতমাতা ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। 'ধনধান্যপুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' উদ্বোধনী সংগীতের পর অনুষ্ঠানের অতিথি ডঃ বাণেশ্বর দাস তাঁর বক্তব্যে কাঁথির সঙ্গে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দে মাতরমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই মন্ত্র ভারতের নবজাগরণ, স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে এবং অদ্যাবধি আধ্যাত্মিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। মুখ্য বক্তা অরবিন্দ দাশ তাঁর প্রাঞ্জল বক্তৃতায় লোকপ্রজ্ঞার কর্মকাণ্ড এবং সমাজ কল্যাণে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকার কথা-সহ বন্দে মাতরম মন্ত্রের সার্বিক উপযোগিতার কথা বিভিন্ন তথ্য-সহ উপস্থাপন করেন। সভাপতি ডঃ দে তাঁর প্রেরণামূলক ভাষণে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বন্দে মাতরমের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশিত হয় একাধিক নৃত্য ও সংগীত। বন্দে মাতরমের আবেগঘন পরিবেশনা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লোকপ্রজ্ঞা কাঁথি চর্চাকেন্দ্রের সংযোজক ডঃ শুভময় পাহাড়ী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কাঁথি চর্চাকেন্দ্রের ব্যাসপ্রমুখ রণদীপ দত্ত। শান্তিমন্ত্র পাঠের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

দুর্গাপুরে ন্যাশনালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরামের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২২-২৩ নভেম্বর ন্যাশনালিস্ট ল'ইয়ার্স ফোরামের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা দুর্গাপুরের সৃজনী অডিটোরিয়ামে সম্পন্ন হলো। রাজ্যের বিভিন্ন আদালতের আইনজীবী সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের উত্তর ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী হরি বারিকরজী, পূর্বক্ষেত্রের সংযোজক কম্ভুপানী পাঢ়ীজী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-পূর্বক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত। অধিবেশনে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষের তাৎপর্য স্মরণ করা হয়।

বহরমপুর লাধুরাম তোষনিওয়াল সরস্বতী শিশু মন্দির এবং সারদা বিদ্যা মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে সপ্তশক্তি সঙ্গম মাতৃসম্মেলন

গত ২২-২৩ নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাশিমবাজার লাধুরাম তোষনিওয়াল সরস্বতী শিশু মন্দির এবং সারদা শিশু মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তশক্তি সঙ্গম মাতৃসম্মেলন। অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের দেওয়া রূপরেখা মেনে অনুষ্ঠান পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করা হয়। মায়েদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা ১২জন মাতৃস্থানীয়াকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, চিকিৎসক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, পরিবেশপ্রেমী, সমাজসেবিকা, বিশিষ্ট সাঁতারু এবং যৌথ পরিবারের সদস্যা। উপস্থিত মাতৃমণ্ডলী অভিনয়ের মাধ্যমে ভারতীয় বীরাঙ্গনা রূপে বিভিন্ন চরিত্র সুন্দর ভাবে সকলের সামনে প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন শিশু মন্দির ও বিদ্যা মন্দিরের আচার্যারা।

সিটিজেন্স এমপাওয়ামেন্ট ফোরামের ভারতীয় সংবিধান দিবস উদ্‌যাপন

সিটিজেন্স এমপাওয়ারমেন্ট ফোরাম, কলকাতার উদ্যোগে কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভামণ্ডপে গত ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সংবিধান দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'ভারতীয় সংবিধান এবং নাগরিক কর্তব্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিটিজেন্স এমপাওয়ারমেন্ট ফোরামের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী দেবাশিস লাহিড়ী। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. পুলকনারায়ণ ধর এবং ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় কার্যকর্তা শ্রীনিবাসজী। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ।

সভার সঞ্চালক বেলুড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রাকেশ দাস বৈদিক শান্তিমন্ত্রের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন। ভারতমাতা এবং ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণের পর স্বাগত ভাষণ রাখেন ফোরামের সম্পাদক অভিজিৎ চক্রবর্তী। অনুষ্কা মণ্ডলের কণ্ঠে একক গীতের পর স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ আশীর্বচন দান করেন। সভার বক্তাদ্বয় ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সুন্দরভাবে ও প্রাঞ্জলভাষায় আলোকপাত করেন। সমাপ্তি ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি দেবাশিস লাহিড়ী। শেষে সমবেতকণ্ঠে বন্দে মাতরম্ সংগীতের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ৬৯তম প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৬ নভেম্বর বিপ্লবী পরিবারের উদ্যোগে কলকাতা মহাজাতি সদনে স্বাধীনতা সংগ্রামী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ৬৯ তম প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয় পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে। বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন চট্টগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে প্রদীপ দত্ত, নুরুল হুদা, পরিমল সেনগুপ্ত, নাতবৌ শ্রীমতী মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, দেবজিৎ মুখোপাধ্যায়, কামাখ্যাচরণ দাস এবং হুতাত্মা বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস প্রমুখ।

'সংগ্রামই জীবন, জীবনই সংগ্রাম'— এই কথাটি বিপ্লবী পরীক্ষিৎ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস, বাঘাযতীন, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সহকর্মী ছিলেন তিনি। বিপ্লবীদের কাছে তিনি 'কাঙাল দা' নামে পরিচিত ছিলেন। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি নাঙলা ব্যাংক, খিদিরপুর বার্ড কোম্পানি, চাউলপট্টি ব্যাংক-সহ বিভিন্ন স্থানে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। একসময় ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং বিভিন্ন জেলে স্টেট প্রিজনার হিসেবে বন্দি থেকে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেন তিনি। বন্দিদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে হাজারিবাগ জেলে ৪৫ দিন অনশনে বসেন। জেলকর্তৃপক্ষ জোর করে নাকে নল ঢুকিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৩১ সালে শিয়ালদহ বোমা মামলায় আবার তাঁর জেল হয়। শেষজীবনে দেশভাগজনিত মুসলমান দাঙ্গা তাঁর গভীর মনোবেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল। স্বাধীন ভারতে তিনি সরকারি কোনো সাহায্য বা পদ গ্রহণ করেননি।

গীতাপাঠ প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে সন্ত প্রবাস যাত্রা মেদিনীপুরে

আগামী ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে যে সন্তযাত্রা সম্পূর্ণ রাজ্য পরিভ্রমণ করছে, তা গত ২১ নভেম্বর সন্ধ্যায় বাইক র‍্যালি সহকারে মেদিনীপুর শহরে প্রবেশ করে। গীতাপাঠ আয়োজন সমিতির বিভাগ সম্পাদক সুহাস পাত্র আগত সাধুসন্ত ও ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে শহরের শ্যাম সজ্ঞ ভবনে নিয়ে আসেন। মেদিনীপুর প্রখণ্ড সমিতির সভাপতি সত্যেন কাপড়ী এবং সম্পাদক সুকৃতি প্রতিহার সবাইকে বরণ করেন। এরপর প্রদীপ প্রজ্বলন করে ধর্মসভার সূচনা হয়। উদ্বোধনী সংগীত (ভক্তিমূলক) পরিবেশন করেন শ্রীমতী পম্পি খামরুই এবং মিতা ঘোষ। সভায় প্রবচন রেখে আগামী ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় ব্রিগেডে পাঁচ লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠে অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানান ঝাড়গ্রামের শ্রী ঋষিকানন্দ মহারাজ এবং ডেবরার স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ। জেলা সম্পাদক নীলকমল পাল এবং দুর্গাবাহিনীর বিভাগ সংযোজিকা শ্রীমতী সুচন্দ্রা মুখোপাধ্যায় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

হাইকোর্টে বন্দেমাতরমের সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

গত ১০ নভেম্বর, 'বন্দেমাতরম্'-এর ১৫০ বছর অনুষ্ঠান পালন করল হাইকোর্টের বিজেপির আইনজীবী সংগঠন। সময় দুপুর ২ থেকে বিকেল ৫টা, ইডেনগার্ডেনে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ছিলেন হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি শঙ্কর প্রসাদ দলপতি, বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট-সহ অন্যান্য আইনজীবী-ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, বিল্বদল ভট্টাচার্য্য, অনুপম দাশগুপ্ত, ড. সিদ্ধার্থ গোস্বামী, গৌতম সরদার, সানন্দ্য ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

সংক্ষিপ্ত ও বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ রূপদান এবং সন্দুর ভাবে উপস্থাপনা করেন বারের সেক্রেটারি শঙ্কর প্রসাদ দলপতি।

বর্তমান সমাজ দর্শনের প্রেক্ষিতে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

উদয়ন চক্রবর্তী

বর্তমানকালে ভারতীয় হিন্দু সমাজকে যদি পর্যালোচনা করা যায়, তবে প্রাথমিক দৃষ্টিতে দুটি ভিন্ন আঙ্গিকের ব্যাখ্যার সম্মুখীন হতে হবে। সমাজের একটি অংশ দীর্ঘকালীন সামাজিক বঞ্চনার অভিযোগ করেন, অপরপক্ষীয়গণ সাংবিধানিক বঞ্চনার শিকার বলে নিজেদের মনে করেন। এই উভয়পক্ষের বিপরীত যুক্তি যদিও পরস্পরবিরোধী, কিন্তু তা একটি সামান্য সমস্যার দিকে অঙ্গুলি হেলন করে— তা হলো বর্তমান ভারতে জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত।

অতীতে ও বর্তমানে বহু তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ও সমাজবিজ্ঞানী এই সমস্যার উৎপত্তি বিশ্লেষণে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বহু কারণের উল্লেখ করেছেন। আমরা যদি মুহূর্তের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হয়ে তাঁকে একজন আদর্শবাদী মানব-মঙ্গলের পথপ্রদর্শক হিসেবে ধরে নিই, পরম-পুরুষকে যদি ক্ষণিকের তরে নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য দূরে সরিয়ে রেখে একজন মাধুর্যমণ্ডিত রক্তমাংসের মানুষ মনে করি, তবে সাধারণ ভাবে এই প্রশ্ন জাগে, যে তাঁদের প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ কী ধরনের আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের তিনটি ডোরে জগদীশ্বর সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত জগতকে আশ্রয় প্রদান করেছেন। ঈশাবাস্য উপনিষদের প্রথম মন্ত্রেও এই ভাবনা অভিব্যক্ত হয়েছে। বেদান্তীরা জগতকে শুধু ঈশ্বরের আলয় রূপেই দেখেন না, অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে এই সৃষ্টি অদ্বিতীয় ঈশ্বরীয় চেতনার বিবর্তন। তাই এই জগৎ— 'চিদাশ্রিত, চিদ্‌বিবর্ত, চিন্ময় ও চিদ্‌বিলাস!'

যদি এই জগতের 'কঙ্কর কঙ্কর মেঁ শঙ্কর হ্যায়', তাহলে আমরা এত ভেদ প্রত্যক্ষ করি কেন? সনাতন ধর্মে এর উত্তর ঈশ্বরের 'চিদ্‌বিলাস' বা লীলার জন্য! ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্যজনিত তারতম্যের কারণে একই আত্মার এই পৃথগত্ববোধ জন্মায়। শ্রীভগবান তাই গীতায় অভূতপূর্ব উদ্ঘোষণা করলেন—

'গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছি।' (গীতা, অধ্যায় ৪, শ্লোক ১৩)

জন্মের সময় প্রতিটি শিশু কিছু অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও প্রবণতা নিয়ে জন্মায়। আর জন্মসূত্রে প্রতিটি শিশুই অন্য শিশুদের চাইতে আলাদা। সমাজের চাহিদা মেটাতে গিয়ে যদি শিশুর এই ব্যক্তিগত

বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুনের কাছে দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ আর সসীম মানবমাত্র সখা থাকেন না, তিনি হয়ে ওঠেন অসীম ঈশ্বর! তখন আর তিনি বসুদেবের পুত্র বাসুদের নন, তিনি সর্বভূতে বাস করেন বলেই তিনি বাসুদেব!

প্রবণতাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া না হয়, তবে সে পরবর্তী জীবনে একজন দুর্বলচিত্ত মানুষে পরিণত হবে। আর অসফল মানুষের সমষ্টি হিসেবে সমাজও হবে সৃজনীশক্তিহীন। বর্তমানকালের বাজার অর্থনীতি আর শিক্ষাব্যবস্থা যেন তাই অসফল মানুষ গড়ার কারখানা; আর অভিভাবককুল এই দক্ষযজ্ঞের যজমান, আর বিদ্যার্থীকুল যেন আহুতি প্রদানের সমিধ!

একটি সমাজে প্রতিটি মানুষের পৃথক পৃথক চাহিদা অনুযায়ী পরিপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা বাস্তবে অসম্ভব। তাই শ্রীভগবান বিধান দিলেন— 'গুণ' অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধকরণের এবং 'কর্ম' অনুযায়ী সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের। যে ব্যক্তির মধ্যে সাত্ত্বিক প্রবণতা বেশি সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, যার মধ্যে রাজসিক প্রবণতা বিদ্যমান সে হলো ক্ষত্রিয়, যার ভেতর রাজসিক ও তামসিক মিশ্র স্বভাব উপস্থিত সে বৈশ্য, আর যে মানুষ নিতান্ত জড় প্রকৃতির, সর্বদা আলস্যভাব যার মধ্যে, সেই তমোগুণাশ্রিত মানুষ হলো শূদ্র। এখানে উল্লেখ্য যে এই শ্রেণী নির্ণয়ের ব্যাপারে জন্ম বা বংশপরিচয়ের কোনো ভূমিকা নেই।

গীতা-প্রদর্শিত সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী সমাজে নিজের নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেকে সেইরূপ সমাজোপযোগী কর্মে নিয়োজিত করলেই সমাজের মঙ্গল। তার ফলেই ব্যক্তিজীবনে সফলতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় গীতার দর্শন আগাগোড়া 'সমাজতান্ত্রিক', কেননা এতে প্রতিটি মানুষের 'কর্মের অধিকার' (Right to Work) স্বীকৃত হয়েছে। আবার অন্যদিকে গীতার দর্শন 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী', কারণ এই সমাজদর্শনে ব্যক্তির অধিকারের এবং নিজস্ব ইচ্ছা ও প্রবণতার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। দুই বিপরীতমুখী আদর্শের সামঞ্জস্যবিধান করতে গিয়ে দার্শনিক শ্রীকৃষ্ণ দুটি মূলনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন—

প্রথম নীতি— সমাজ ব্যক্তিকে তার জন্মগত গুণ ও কর্মপ্রবণতার প্রতি লক্ষ্য না রেখে যে কোনো কর্মে প্রবৃত্ত করতে পারবে না; এবং

দ্বিতীয় নীতি— ব্যক্তি নিজের জন্মগত গুণ ও কর্মপ্রবণতার বিকাশ না ঘটিয়ে ইচ্ছামতো সমাজে যে কোনো বৃত্তি (Social Role) গ্রহণ করতে পারবে না।

আধুনিক সমাজ ও প্রশাসনিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি সাধারণ নিয়মের নির্যাস রূপে আমরা আরও কতকগুলি সামাজিক ও প্রশাসনিক নীতিমালা পেতে পারি—

১. প্রতিটি ব্যক্তির জন্মগত গুণ ও কর্মপ্রবণতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্ব; একেই 'রাজধর্ম' বলা হয়েছে।

২. প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য দেশের কল্যাণের জন্য নিজের অন্তর্নিহিত সামর্থ্যকে পরিপূর্ণ রূপে নিয়োগ করা।

৩. প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক যাতে নিজের বিকশিত সামর্থ্যকে কর্মে প্রযুক্ত করে দেশের কল্যাণ করতে পারে, সেই জন্য যথোপযুক্ত এবং যথেষ্ট সংখ্যক বৃত্তির (Social Roles) সৃষ্টি করা এবং সমাজের প্রতিটি বৃত্তির জন্য উপযুক্ত দক্ষ কর্মযোগী ব্যক্তির বিকাশ সাধন করা বিধেয়।

৪. নাগরিকের নিজের অন্তর্নিহিত গুণ ও কর্মপ্রবণতার বিরুদ্ধ অনুপযোগী বৃত্তিগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের সৃজনশীলতা ও উৎপাদন ক্ষমতার অপচয় রোধ করা প্রয়োজন।

সমাজ ও ব্যক্তির বিপরীতমুখী চাহিদা ও স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সমাজের ভারসাম্য রক্ষার যে প্রচেষ্টা তারই নাম 'ধর্ম'। এই ধর্ম যখন বিঘ্নিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে যখন ভারসাম্যের হানি ঘটে তখনই সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ সমাজের বাকি অংশের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে সমাজ জীবনের প্রবহমানতাকে বিপন্ন করে। আর তখনই বিরাট সমাজ-পুরুষের অবতরণের প্রয়োজন হয়।

ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণ ও কর্মপ্রবণতাকে ভাগ করার পর শ্রীভগবান সমাজের বৃত্তিসমূহকেও (Social Roles) চারভাগে বিভক্ত করলেন—

১. তমোগুণ প্রধান মানুষরা সাধারণত জড়তাসম্পন্ন এবং বিলাসপ্রিয় হন। তাই সমাজের অন্যান্য বর্ণের মানুষদের কর্মে সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের মধ্যেও অন্য সকল বর্ণের মানুষদের অনুরূপ প্রবৃত্তিগুলি জেগে উঠবে। আবার তারা কল্পনাপ্রবণ। তাই তাঁদের যদি শিল্পকলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তবে তাদের হাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম সমূহ গড়ে উঠতে পারে।

২. তমোগুণ ও রজোগুণ মিশ্র যাঁদের স্বভাব তাঁরা কল্পনাপ্রবণ হওয়ার পাশাপাশি উদ্যমী হন। তাই তাঁদের জন্য দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত আধুনিক কৃষি, পশুপালন, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি উপযুক্ত।

এই উভয় বর্ণই হলো গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর ভাষায় Producers.

৩. সমাজে যাঁদের মধ্যে রাজসিক ভাব প্রবল, তাঁদের শাসক ও যোদ্ধার সামাজিক ভূমিকায় (Social Role) নিজেকে নিযুক্ত করা। কারণ— 'পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, কর্মকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা, অন্যকে শাসন করার ক্ষমতা— এগুলি এঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।' (অধ্যায় ১৮, শ্লোক সংখ্যা ৪৩)

প্লেটোর বর্ণনায় এঁদেরই নাম Auxiliaries।

৪. এছাড়া সমাজে যারা সাত্ত্বিক গুণাবলীসম্পন্ন, তাঁরা হবে Civil Society বা সুশীল সমাজের অঙ্গ। এঁরা শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে জনগণকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুরক্ষিত রাখবে। এই শ্রেণীকেই শ্রীভগবান ব্রাহ্মণ বলে চিহ্নিত করেন। গ্রিস দেশের দার্শনিক প্লেটো এঁদেরকে বলেন The Guardian Class।

প্লেটো বলছেন, মানবাত্মার তিনটি ভাগ— Appetite, Spirit, ও Reason। ঠিক যেন আমাদের সনাতন ধর্মের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের মতো। এই তিনটি ভাগের প্রাবল্য অনুযায়ী সমাজের সকল মানুষকে প্লেটো যথাক্রমে Producers, Auxiliaries এবং

The Guardian Class— এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই তিন শ্রেণীও আমাদের সনাতন ধর্মে শ্রীভগবান প্রণীত ‘বৈশ্য-শূদ্র’, ‘ক্ষত্রিয়’ এবং ‘ব্রাহ্মণ’— এই বর্ণব্যবস্থার অনুরূপ।

গীতায় শ্রীভগবান ক্ষত্রিয়াদি তিনটি বর্ণের স্বভাব নির্ণয়ের পাশাপাশি ব্রাহ্মণদের সংজ্ঞা নিরুপণের প্রয়োজন কেন বোধ করলেন? মহাভারতের সময়কালে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা গুণানুক্রমিক হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। বৈদিককালে ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র নিজ তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তানেরা যদি পিতার মতো সাত্ত্বিক জীবন পালন না করত, তবে তাদেরও নিম্নকুলে অধঃপতন হতো। তাই বৈদিককালের ব্রাহ্মণ ঋষিরা নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখতে কঠোর তপশ্চর্যাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতেন। স্মৃতিকারাও সমাজে ব্রাহ্মণদের জন্য সর্বাধিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছেন। ব্রাহ্মণদের সম্মতি ব্যতীত কোনো ক্ষত্রিয় রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হতে পারতেন না। এরই একটি আনুষ্ঠানিক রূপ ছিল ‘রাজ্যাভিষেক’, যাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা যজুর্বেদ হতে মন্ত্র উচ্চারণ করতেন— ‘সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাম্ রাজা’ (যজুঃ/১০/১৮) অর্থাৎ —হে রাজন, তুমি সিংহাসনে আসীন হয়ে প্রজাপ্রতিপালন কর। কিন্তু আমাদের শাসন করতে যেও না! কারণ আমাদের রাজা শুধুমাত্র ‘সোম’ নামধারী ঈশ্বর।

এই ছিল প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্রের আদি স্বরূপ, যেখানে শাসকবর্গের উপর সিভিল সোসাইটি বা ত্যাগী ব্রাহ্মণদের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ চলত। কিন্তু বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী কোনো সুন্দর বস্তুই চিরকাল স্থায়ী হয় না। ধীরে ধীরে গুণানুক্রমিক বর্ণধর্ম যখন বংশানুক্রমিক রূপ নেয়, সমাজে ব্যক্তির গুণ ও কর্মপ্রবণতার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরে উন্নয়ন বা অধঃপতন যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন সমাজও গতিহীন হয়ে পড়ে।

এক্টন সাহেবের উক্তিটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য— Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely। অধঃপতনের ভয় দূরীভূত হলে অতিমাত্রায় ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ফলে তৎকালীন বোদ্ধা সমাজেরও তাই হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্রের মতো অপদার্থ নেতা এবং পুরোহিত কৃপাচার্য ও গুরু দ্রোণাচার্যের চোখের সামনে ক্ষমতালোভী দুর্যোধনের উত্থান এই সামাজিক অবক্ষয়কেই চিহ্নিত করে। তাঁরা শুধুমাত্র নিজের নিজের ক্ষমতার কেন্দ্রটিকে সুরক্ষিত রাখতে দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছেন। দ্রোণাচার্যের ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হতে হস্তিনাপুরের ক্ষমতার অলিন্দে উত্থান এবং পাঞ্চাল-নরেশ দ্রুপদের প্রতি দীর্ঘলালিত প্রতিহিংসার অনল তাঁকে বাধ্য করেছে ধর্মাশ্রয়ী পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতে।

গুণ ও কর্মপ্রবণতা ভিত্তিক যে আদর্শ সমাজের চিত্র দার্শনিক শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করেছিলেন, তা সফল করার জন্য প্রয়োজন ছিল এক যুগান্তকারী বিপ্লবের। তাই কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তা শুধু কৌরব বনাম পাণ্ডবদের ক্ষমতা দখলের লড়াই ছিল না; এটা ছিল এক অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে এক সম্পূর্ণ নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটির পুনর্মূল্যায়ন করার। আর সমাজপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের নতুন সংজ্ঞা নিরূপণ করলেন এই ভাবে—

‘যাঁর মধ্যে মনের নিয়ন্ত্রণ, ইন্দ্রিয় সংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, বিদ্যা, বিবেক, সরলতা এবং ঈশ্বরে সমর্পিত বুদ্ধি— এই নয়টি লক্ষণ থাকবে, তিনিই ব্রাহ্মণ।’ (গীতা, অধ্যায় ১৮, শ্লোক সংখ্যা ৪২)

এই মাপকাঠিতে বিচার করলে দ্রোণ-কৃপ প্রমুখের তুলনায় মহাত্মা বিদুর অধিকার্থে ব্রাহ্মণ। তাই সমাজপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্বের এই নতুন সংজ্ঞা নিরূপণের মাধ্যমে প্রকারান্তরে ক্ষমতাশীল দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রমুখের ব্রাহ্মণত্ব খারিজ করলেন; যা ছিল গতানুগতিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ! সেই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ একজন আদর্শ বিপ্লবী!

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, সমাজ ও ব্যক্তির বিপরীতমুখী চাহিদা ও স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সমাজের ভারসাম্য রক্ষার যে প্রচেষ্টা তারই নাম ‘ধর্ম’। এই ধর্ম যখন বিঘ্নিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে যখন ভারসাম্যের হানি ঘটে তখনই সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ সমাজের বাকি অংশের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী হয়ে সমাজ জীবনের ধারাপ্রবাহকে বিপন্ন করে। আর তখনই সমাজপুরুষের অবতরণের প্রয়োজন হয়।

আর এই সমাজপুরুষ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিবিশেষ নন, তিনি সমগ্র সমাজের সকল শ্রেণীর মনুষ্যকুলের প্রতিনিধিত্বকারী! কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন তাই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সমগ্র সমাজের সম্মিলিত বৈপ্লবিক শক্তিকে অবলোকন করেন—

‘অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।’

(বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, শ্লোক সংখ্যা ১৬)

বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুনের কাছে দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ আর সসীম মানবমাত্র সখা থাকেন না, তিনি হয়ে ওঠেন অসীম ঈশ্বর! তখন আর তিনি বসুদেবের পুত্র বাসুদের নন, তিনি সর্বভূতে বাস করেন বলেই তিনি বাসুদেব!

বর্তমান সময়কালে আমাদের মনন যখন বিবিধ নিত্যনতুন সামাজিক দর্শন ও প্রয়োগের দ্বন্দ্বে সংশয়ান্বিত, আমরাও অর্জুনের মতো শ্রীভগবানের চরণকমলে আত্মনিবেদন করি ‘শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।’ হে ভগবান, তুমিই আমাদের শ্রেয়মার্গের পথপ্রদর্শন করো! কারণ, তুমি কথা দিয়েছো, যখন যখন ধর্মের হানি ও অধর্মের উত্থান ঘটবে, তখন তখন দুষ্কৃতীদের বিনাশ ও সাধু ব্যক্তিদের পরিত্রাণের জন্য এবং ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের নিমিত্ত, তুমি আসবে! ‘তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ!’ □

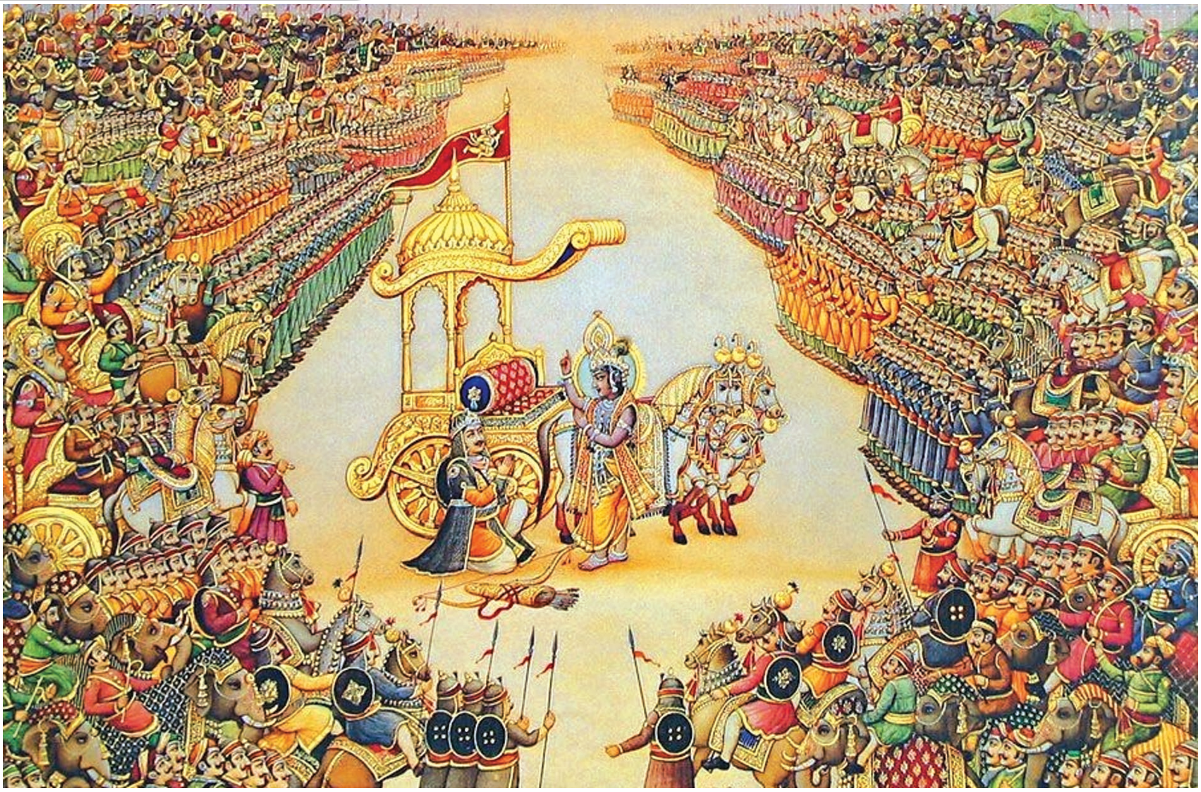

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিটি অধ্যায় ক্রিয়াযোগাধ্যায়

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রতিটি মানুষের প্রাণস্বরূপ বলা হয় যা পাঠ করলে অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের পাঠ নিষ্প্রয়োজন। এর কারণ, গীতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখসঞ্জাত।

শ্রীচৈতন্যময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রয়োজিকা।
সর্ব্বশ্রাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা মা বিশিষ্যতে।।
(শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার গীতামাহাত্ম্যম্-১৯)

অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রের সারভূতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পরম পবিত্র বলে প্রশংসিতা। গীতা ধর্মময়ী ও সর্বজ্ঞানদায়িনী। এছাড়াও গীতামাহাত্ম্য বিষয়ে শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার আরও বলছে :

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতনা।
বেদ শাস্ত্রপুরাণানি তেলাধীতানি সর্ব্বশঃ।। (২৩)

অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট চিত্তে যিনি গীতাপাঠ করেন, তিনি সমুদয় বেদ, অখিল শাস্ত্র ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন।

শ্রীগীতামাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলছেন, 'গীতা আমার পরম ব্রহ্মবিদ্যা, এতে কোনো সংশয় নেই, অর্ধমাত্রাহরা গীতা, নিত্যা ও অনির্বাচ্য পদাত্মিকা।

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্ধমাত্রাহরা নিত্যমনির্ব্বাচ্য পদাত্মিকা।। (৪৭)
(শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার-গীতামাহাত্ম্যম্-৪৭)

শুধু তাই নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলছেন, 'গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার উত্তম সারভাগ, গীতা আমার অত্যুগ্র এবং অব্যয় জ্ঞান; এমনকী গীতা আমার উত্তম স্থান, পরমপদ, পরম গুহ্য ও পরম গুরু। আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি, গীতা আমার পরম গৃহ এবং গীতাজ্ঞানকে আশ্রয় করে আমি ত্রিলোক পালন করি।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানম ব্যয়ম্।। ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ।। ৪৫
গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্।। ৪৬

শ্রীগীতার আঠারোটি অধ্যায় আঠারো প্রকার পন্থায় সাধনার উপদেশ থাকলেও পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রতিটি পন্থাই প্রকৃতপক্ষে কর্মের মার্গ। আর কর্মমার্গ মানেই ক্রিয়ার মার্গ। আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন, যাই করি না কেন, সবই আদতে কর্ম বা ক্রিয়া। আমাদের পঠনপাঠন, চলা-ফেরা, শয়ন-স্বপন, মনন, ভাবনাচিন্তা, খাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস সর্বই শাস্ত্রানুসারে কর্ম বা ক্রিয়া প্রক্রিয়া। ঈশ্বরকে তখনই পাওয়া যায় স্বয়ং যখন ঈশ্বরত্বে অধিষ্ঠান করা যায়। ঈশ্বরত্ব বা কৃষ্ণতত্ত্ব অথবা শিবত্ব প্রাপ্তি সবই মনের

অবস্থা বিশেষ। এই বিশেষ মানসিক অবস্থায় উন্নীত হওয়া যায় কর্ম বা ক্রিয়ার মাধ্যমে। ক্রিয়াযোগই সেই পন্থা যার প্রতিটি সোপান মানুষকে একটু একটু করে পৌঁছে দিতে পারে চূড়ান্ত বোধে। গীতাধর্ম তাই কর্মের ধর্ম, এক মহাবোধের পথ! গীতাপাঠ করতে করতে ধীরে ধীরে উন্মেষ ঘটে এই পথরেখার! তাই তো শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁর প্রণীত গীতা-মাহাত্ম্যে বলেছেন—

গীতাধ্যায়নশীলস্য
প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি
পূর্বজন্মকৃতানি চ।। (২)

(শ্রীশঙ্করাচার্য—গীতা মাহাত্ম্য (২))

কেউ যদি আন্তরিকভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে গীতা পাঠ করে অর্থাৎ কর্ম করে, তাকে মনন করে এবং নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ প্রাণায়াম বা ক্রিয়াযোগ পদ্ধতি অনুসরণ করে তাহলে তার পূর্বজন্মকৃত প্রারব্ধ আর তাকে প্রভাবিত করে না। তার মানে পঠন কর্ম, মনন কর্ম শেষে মানুষ যখন ধীরে ধীরে ক্রিয়াযোগ কর্মমার্গে প্রবেশ করে প্রকৃত সদ্‌গুরুর কৃপায়, তখন গুরু দ্বারা প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগ পন্থা তার পূর্বজন্মের প্রারব্ধ ক্ষয় করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বর্তমান জন্মের প্রারব্ধ জাল কাটিয়ে পৌঁছে দেয় মহাবোধী সত্ত্বায়, শিবত্বে বা কৃষ্ণত্বে।

পঠন, মনন পরবর্তী স্তরে রয়েছে স্বাধ্যায় অর্থাৎ স্ব+অধ্যায়। নিজেকে প্রণিধান অর্থাৎ স্ব-কে নিজেকে প্রকৃষ্টভাবে নিধান বা ব্রাহ্মী স্থিতিতে অবস্থান। সেটাই আসলে মহাবোধী সত্ত্বা। ঋষি পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শনে বলেছেন—

'তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।'

এই স্বাধ্যায় থেকে মহাবোধী সত্ত্বা প্রাপ্তি, এটাই ক্রিয়াযোগ। যে পন্থায় সাধক নিজেই ঈশ্বর হয়ে যান, যিনি সর্বময় কর্তা, তিনিই যে কর্মভাবে সচেষ্ট তাই তো কৃ-ধাতু বা ক্রিয়ার ভাব। তাই গীতাজ্ঞান বা গীতাবোধকে আশ্রয় করে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিলোক পালন করেন। ক্রিয়াযোগ সাধনার ফলে মানব অর্থাৎ সাধক ধীরে ধীরে সঞ্জয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। ক্রিয়ার ফলে আজ্ঞাচক্র বা পিনিয়ান গ্ল্যান্ড সক্রিয় হলেই সঞ্জয় অবস্থা বা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন যোগী। তাই শ্রীগীতায় প্রথম অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত যোগের প্রতিটা পন্থা ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করেন সঞ্জয়। ধৃতং রাষ্ট্রঃ যেন যঃ, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র হলেন দেহরূপ রাষ্ট্র। যাকে মন দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে নিজ আয়ত্তে বা বশে রেখে দিয়েছে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ না হতে পারলে মনের আয়ত্তের বাইরে যাওয়া অসম্ভব। ক্রিয়াযোগ এই ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে নিয়ে আসার রাস্তায় একটির পর একটি স্তরে সাধককে বা যোগীকে উন্নীত করে। ইন্দ্রিয়গুলির

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ কীভাবে কৌরবদের কবল থেকে নিস্তার পাবে তারই পন্থা শ্রীগীতার আঠারোটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তাই শ্রীগীতার প্রতিটি অধ্যায়ই যোগাধ্যায়।

প্রতি আসক্তি সাধককে বা যোগীর মনকে শিবত্ব প্রাপ্তি থেকে বিরত রাখতে চায়। তাই শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে মন বা দেহরূপ রাষ্ট্র সঞ্জয় বা দিব্যদৃষ্টি বা সদগুরুর কাছে মানব দেহ বা ধর্মক্ষেত্র অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ চলছে অবিরত তার বিবরণ জানতে চাইছে। মুমুক্ষু চাইছে কী পন্থায় এই যুদ্ধ করা হবে এবং মনের উৎক্রমণের পথনির্দেশই-বা কী?

এই শরীর যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থল, তবুও এটাই সাধনস্থল, তাই এটাই ধর্মক্ষেত্র! এটি কর্মস্থল, সে কারণেই কুরুক্ষেত্র। মানুষ বা সাধক সাধনরাজ্যে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের সঙ্গে নিবৃত্তি-পক্ষের যুদ্ধ শুরু হয়। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কী কী পন্থায় যোগী জয়লাভ করবেন, সেই যুদ্ধ পদ্ধতি বা যোগপন্থাই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। এই মন বা দেহরূপ রাষ্ট্রের শত পুত্র হলো দশটি ইন্দ্রিয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ)। এই দশটি ইন্দ্রিয় দশদিকে ভোগলালসায় ধাবমান। অর্থাৎ ১০×১০=১০০ পুত্র। এরাই প্রবৃত্তি পক্ষ বা কৌরব। উলটোদিকে পঞ্চপাণ্ডব বা পঞ্চতত্ত্ব। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। এরা নিবৃত্তি পক্ষ। এই পঞ্চতত্ত্বের অবস্থান মানবদেহের মেরুদণ্ডের বিভিন্ন চক্রে। ইন্দ্রিয়গুলির অবস্থান শরীরের সামনের বা বাহ্যিক দিকে। মেরুদণ্ডের নিম্নস্থানে গুহ্যদ্বারের একটু উপরে মূলাধার চক্র বা ক্ষিতিতত্ত্ব। যেটি চার দল পদ্ম। লিঙ্গমূলের পেছনে মেরুদণ্ডের মধ্যে ছয় দলবিশিষ্ট পদ্ম স্বা স্বাধিষ্ঠান চক্র নামে পরিচিত। এটি জলতত্ত্ব বা অপ। নাভির বিপরীতে দশ দলবিশিষ্ট মণিপুর চক্র, যা তেজস্তত্ত্ব। হৃদয়ের পেছনে মেরুদণ্ডের মধ্যে ১২ দলবিশিষ্ট পদ্ম যা অনাহত চক্র নামে পরিচিত, যা মরুৎ বা বায়ুতত্ত্ব। কণ্ঠের পেছনে মেরুদণ্ডের মধ্যে ষোলো দলবিশিষ্ট বিশুদ্ধাখ্যা বা ব্যোমতত্ত্ব। দুই ভ্রূ-র মধ্যে রয়েছে দ্বিদল বিশিষ্ট আজ্ঞাচক্র বা কূটস্থ; যিনি এই দেহরূপ রথের সারথী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর মণিপুরে অর্জুন রয়েছেন যিনি তেজস্তত্ত্ব। নাভির তেজই সাধনার সহায়ক। প্রাণ ও অপান বায়ুর কার্য এই নাভিতেই বর্তমান। এই প্রাণ অপানের কার্য থেমে গেলে শরীরপাত হয়। পঞ্চতত্ত্বের কাজ মনকে ইন্দ্রিয় বা কৌরব পক্ষের কবল থেকে কৌশলে টেনে এনে ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থায় অর্থাৎ কূটস্থে স্থিত করতে এবং তারও উর্ধ্বে সহস্রারে পৌঁছে দিয়ে মহা বোধিত্ব লাভ করতে। তাই তো ধর্নুধারী অর্জুনের সারথী হন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ কীভাবে কৌরবদের কবল থেকে নিস্তার পাবে তারই পন্থা শ্রীগীতার আঠারোটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তাই শ্রীগীতার প্রতিটি অধ্যায়ই যোগাধ্যায়।

ফ ঃ ৫

জগজ্জননী মা সারদা

বৈশাখী কুণ্ডু

মা সারদা নামটা মনে এলেই একটাই চিত্র ভেসে ওঠে। সেটি হলো লাল পেড়ে শাড়ি পরা ঝরঝরে নির্মল একটি মুখ। যেটা দেখলেই জীবনের সমস্ত কষ্ট বেদনা নিমেষে উধাও। বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটি গ্রামটি বিখ্যাত। কারণ এখানে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর কোল আলো করে আসেন মা সারদা ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর। সারদা শব্দের অর্থ সরস্বতী। সেইসময় ওই প্রত্যন্ত গ্রামে মেয়েদের শিক্ষালাভের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তথাপি ছোটো থেকেই সারদা দেবী পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা এত সুন্দর করে সাজিয়েগুছিয়ে বিশ্লেষণ করতেন যা কোনো পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যাবে না। একটু দেখা যাক তাঁর সহজ সরল কথা যা আমরা 'বাণী' বলে অভিহিত করেছি—

(১) মানুষকে ভালোবাসলে কষ্ট পেতে হয় কিন্তু ভগবানকে ভালোবাসলে কোনো কষ্ট থাকে না। শুধু কর্তব্য করে যাও। আর ভগবানকে ভালোবাসো।

(২) ভগবান মানুষের মধ্যে বাস করে। না জেনে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা।

(৩) ভগবানকে কি কেউ বাঁধতে পারে? তিনি যার কাছে ধরা দেন নিজে থেকেই ধরা দেন। তিনি নিজে মা যশোদার কাছে ধরা দিয়েছিলেন বলেই বাঁধতে পেরেছিলেন।

(৪) মানুষের হাজার উপকার করে একটি দোষ করো। অমনি মুখটি বেঁকে যাবে। দোষটা কে দেখে! কিন্তু গুণটা তো দেখতে চাই।

(৫) যদি শান্তি চাও তো কারোর দোষ দেখো না। দোষ দেখো নিজের। জগতকে আপন করে নিতে শেখো, কেউ পর নয়।

এই রকম আরও অনেক বাণী সারাজীবন ধরে দিয়েছেন আমাদের। খুব সহজ সরল অথচ গভীরতা অনেক বেশি।

জগৎকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পাঁচবছর বয়সে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ঠাকুরের যোগসূত্রে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পদার্পণ করেন। চন্দ্রমোহন দত্ত মায়ের মন্ত্র শিষ্য। আঠারো বছর বয়সে সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের কাছে শিখেছিলেন গৃহস্থালির কাজ ও আধ্যাত্মিক কাজকর্ম। ক্রমে ঠাকুরের শিষ্যদের কাছে মা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মাতৃসুলভ আচরণে তিনি সবার মা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিশুদ্ধতা, অসাধারণ সহনশীলতা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, নিঃশর্ত সেবা, আধ্যাত্মিক আলোকসজ্জার কারণে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আধুনিক যুগের নারীর আদর্শ বলে অভিহিত করেছেন। স্বামীজী অনুভব করেছিলেন নারীদের অবহেলার কারণে ভারতের অবনতি। তিনি বিশ্বাস করতেন মায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের নারী জাগরণ শুরু হয়েছিল। সারদা দেবীর মাতৃস্নেহের কিছু ভাবনা, যেমন—

(১) আমার সন্তান যদি ধুলো বা কাদায় পড়ে তবে আমারই দায়িত্ব তাকে পরিষ্কার করে কোলে তুলে নেওয়া।

(২) তোমার পায়ে কাঁটা বিঁধলে তা যেন আমার হৃদয়ে কাঁটার মতো বেঁধে। আমি যেমন সদাচারীর মা তেমনি দুষ্টেরও মা।

(৩) কথায় কথায় কাউকে আঘাত দেওয়া উচিত নয়, অপ্রয়োজনীয়ভাবে কাউকে অপ্রীতিকর সত্য কথা বলা উচিত নয়, নিজের কথার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলে সংবেদনশীলতা নষ্ট হয়ে যায়।

(৪) মায়ের কাছে সন্তানের কোনো জাত নাই।

(৫) জগতের কাছে

মাতৃত্বভাবকে প্রকাশ করার জন্যই আমাকে ঠাকুর রেখে গেছেন। তাই কারো 'মা' ডাক উপেক্ষা করতে পারি না। ইত্যাদি আরও অনেক মাতৃস্নেহের কথা তিনি বলে গেছেন।

আলিপুর বোমা মামলার রায় ঘোষণার পর মায়ের কাছে বিপ্লবীদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছিল। এজন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে রাজরোষে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু পরিত্রাতা সেই 'মা'। আসলে সঙ্ঘজননী রূপে সারদা মায়ের সিদ্ধান্তই শেষ কথা। তারপরেও সমস্যা দীর্ঘতর হয়। বঙ্গভঙ্গের পর অনেক বিপ্লবী মিশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এতে ইংরাজ সরকার যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং তাদের বহিষ্কারের দাবি উঠেছিল। এতে মা বিব্রত বোধ করেন। তিনি বলেন, ''ঠাকুরের ইচ্ছায় এই মিশন তৈরি হয়েছে। যেসব তরুণ যুবক সংসারের মোহ ত্যাগ করে দেশের সেবায়, আর্তের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে, তারা এই ঠাকুরের আশ্রয়ে থাকবে না তো কি গাছতলায় থাকবে?'' তৎকালীন মিশন প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইংরাজ সরকারকে মিশনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলতে। বলা বাহুল্য মায়ের কথায় সরকার পক্ষ শান্ত হয়েছিল। এই নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন মতবাদ আছে। দেহ রাখার পূর্বে মায়ের বক্তব্য ছিল, ''যারা এসেছিল, যারা আসবে, যারা আসেনি সবার ওপর আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রইল।'' এটাই ঠাকুরের ইচ্ছা।

ভগিনী নিবেদিতাকে শ্রীশ্রী মা 'খুকি' বলে ডাকতেন। নিবেদিতার লেখা 'The Master as I saw him' গ্রন্থটিতে তিনি বলেছেন, মায়ের মধ্যে যেমন সাধারণ নারীর মাধুর্য ছিল, তেমনি দেবীর মতো উদার হৃদয় ও মহত্ব ছিল। সমস্যা যত জটিল ও নতুন হোক, প্রতিটির সমাধান তাঁর কাছে। নিবেদিতার সঙ্গে মা সারদার মা ও মেয়ের সম্পর্ক ছিল। নিবেদিতার স্কুলের উদ্বোধন করেন মা। সমস্ত ভক্তকে উপদেশ দিতেন ওই স্কুলে পাঠাতে। ভারতীয় মাতার সম্পর্কে ধারণার জন্য স্বামীজী নিবেদিতাকে সারদা মায়ের কাছে এনেছিলেন। স্বামীজীর কাছে মা সারদা ছিলেন জীবন্ত দুর্গা। গুরুমায়ের কাছে যাবার আগে স্বামীজী নিজেকে শুদ্ধ করে নিতেন। গঙ্গা স্নান করে, গঙ্গা জলে আচমন করে মন-প্রাণ বিশুদ্ধ করে তাঁর পদতলে বসতেন।

এমন জগৎজননী সারা জীবন ধরে অনেক ভালোবাসার বাণী বিলিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সন্তানেরা তাঁর পদতলে অবনত। এমনকি রাজশক্তিও মায়ের মানসিক দৃঢ়তার কাছে পরাজিত। দেশ জুড়ে যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে তখনও মা শান্ত চিত্তে থেকেছেন এবং বিপ্লবীদের দীক্ষামন্ত্র দিয়েছেন।

বড়ো বড়ো পুঁথি, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ইত্যাদি জয়রামবাটির মতো প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে মা সারদার কাছে তুচ্ছ। সারদা মায়ের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানাই।

মায়ের বাড়ি, জয়বাটি, বাঁকুড়া

শক্তিরূপিণী মা সারদা

সুতপা বসাক ভড়

ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনায় যে পরমতত্ত্ব আমাদের একমাত্র ধ্যেয়, জ্ঞেয় ও উপায়রূপে প্রতিষ্ঠিত, তার সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত হয়ে আছেন শক্তি। ব্রহ্ম নামে তাঁকে চিহ্নিত করলে শক্তি ধরেন মায়ার রূপ এবং সেই মায়ার অধিষ্ঠাতা হন ব্রহ্ম। আবার পুরুষরূপে অবতীর্ণ হলে তাঁর নিত্য অনুগামিনী হন প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি। শিবরূপে আরাধনাকালে শক্তি আসেন সদা-সহচারিণীরূপে। সীতা-রাম, হর-গৌরী, রাধা-কৃষ্ণকে আমরা দেখি সগুণ উপাসনার ক্ষেত্রে। আমাদের উপাস্য সর্বদা যুগলমূর্তিরূপে আমাদের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

আমরা দেখতে পাই বিমর্শের অধীনে সর্বদা প্রকাশের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। নচেৎ সবকিছু থেকে যেত অপ্রকাশ, ঘন অন্ধকারে চতুর্দিক আবৃত হয়ে যেত। তন্ত্র রসায়নে অভিজ্ঞরা বলেন, শিবের ই-কারটি না থাকলে, তিনি শবে পরিণত হন। এই ই-কার হলেন ইচ্ছারূপিণী বিমর্শময়ী মহাশক্তি— নিঃস্ব, রিক্ত, শ্মশানচারী ভগবান শিবের বৈভব অথবা ঐশ্বর্য। ভবানীর পাণিগ্রহণের মাধ্যমে ভূত-প্রেতের অধীশ্বর থেকে তিনি হয়েছেন জগদ্দীশ্বর। আদি শঙ্করাচার্য তাঁর দেবীস্তুতিতে লিখেছেন :

'চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানী ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটী ফলমিদম্।।'

—যাঁর সর্বাঙ্গে বিলিপ্ত কেবলমাত্র চিতাভস্ম, গরল বা বিষ যাঁর আহার, যাঁর বসনও জোটেনি, যিনি দিগম্বর, মাথায় জটার জঞ্জাল, সাপের মালা যাঁর গলায়, হাতে যাঁর নরকপাল, সেই ভূত-প্রেতের অধীশ্বর হয়ে গেলেন জগদীশ্বর! ভবানি! এসকল তোমার পাণিগ্রহণের ফল।

শক্তির এই প্রাধান্যকে অনুভব করে বৈদিক ঋষি অগ্নির মাধ্যমে দেবতাদের যজ্ঞে আবাহন করার জন্য সেই যজনীয় দেবতাগণকে 'পত্নীবান' বা 'শক্তি'যুক্ত করার জন্য অগ্নির কাছে প্রার্থনা করছেন :

'তান্ যজকত্রা ঋতাবৃধোহগ্নে পত্নীবতস্কৃধি।
মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য়।।'

এবার যুগাবতার এলেন সপত্নীক বা সশক্তিক হয়ে। পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাকুমারীরূপে ঠাকুরের পাণিগ্রহণ করে তিনি দেখালেন, স্বরূপতঃ তিনিই হলেন আদি কৌমারী শক্তি, যিনি অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে একদা ঘোষণা করেছিলেন :

'অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধনমম
যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্টে ভুবনানু বিশ্বো—
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি।।'

—'পিতারও আমি প্রসবিতা'— এক পরমাশ্চর্য উদ্ঘোষ! সত্যই মা অতুলনীয়া; ব্যাপ্ত হয়ে আছেন চরাচরে।

ঠাকুর মাকে চিনেছেন স্ব-রূপে। সেজন্য বলেছেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন'। শিষ্যদের তিনি বলেন, 'ওই যে মন্দিরে মা রয়েছেন আর নহবতের মা— অভেদ।' একদা হৃদয়কে সতর্ক করেন, 'ওরে, হৃদে, একে (অর্থাৎ তাঁকে, ঠাকুরকে) তুই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (অর্থাৎ শ্রীশ্রীমাকে) আর কখনো এমন কথা বলিসনি। এর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস, কিন্তু ওর ভেতর যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।' ঠাকুরের এই উক্তির মধ্যে রয়েছে গভীর ইঙ্গিত!

'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না'— কারণ ওঁরা সকলেই সেই মহাশক্তি থেকেই উদ্ভূত, তাঁরই প্রসূতি, সেজন্য তাঁর ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা করতে তাঁরা অসমর্থ। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রারম্ভেই ব্রহ্মার স্তবে আমরা দেখি :

'বিষ্ণু শরীরগ্রহণমহমীমান এব চ।
পরিতাস্তে যতোহতস্ত্বাং কঃ স্তোতুঃ শক্তিমান ভবেৎ।'

পরমা আদ্যাশক্তির স্তুতি করার শক্তি কার আছে? তাঁর মহিমা ব্যাখ্যা করার সামর্থ্যই বা কার আছে? কারণ, তিনিই ব্রহ্মাবিদ, সকলের শরীর গ্রহণ করিয়েছেন, তাঁদের উদ্ভব তাঁর থেকেই। সেজন্য যিনি সকলের মূল, সকলের উদ্ভবস্থ, সেই 'অমূলং মূলং'-এর অর্থাৎ মূলহীন সেই মূলের স্বরূপ উদ্ঘাটন কে করবে?

শক্তিরূপিণী মা সারদার মহিমা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে বিশ্বের মাঝে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে ষোড়শীরূপে পূজা করেছিলেন এবং জপের মালা, সমগ্র সাধনার ফল এবং নিজেকেও তাঁর চরণে সমর্পণ করেছিলেন।

একজন শিষ্য মাকে প্রশ্ন করে, 'মা, আপনি ঠাকুরকে কীভাবে দেখেন?' কিছুক্ষণ নীরবতার পর গম্ভীরভাবে মা'র উত্তর ছিল, 'সন্তানের মতো দেখি।'

শ্রীশ্রীমা পরীক্ষাছলে একবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি তোমার কে?' ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, 'তুমি আমার মা আনন্দময়ী'। তাঁর প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন, '(ও) জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী, ও কী যে সে! ও আমার শক্তি!'

স্বামী প্রেমানন্দের কথায় : 'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীমতী রাধারাণী এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন! ঐশ্বর্যের লেশ নাই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল; তাঁর ভাবাবেগ, সমাধি এসব আমরা জন্মে দেখেছি— কত দেখেছে! কিন্তু মা'র— তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কী মহাশক্তি! —জয় মা! জয় মা! জয় শক্তিময়ী মা!' □

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে
নোয়াখালির কসাই

অধ্যাপক (ড.) স্বাগত বসু

সেদিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। বাঙ্গালির বাড়িতে বাড়িতে চলছে মা লক্ষ্মীর আরাধনা। বাড়িতে বাড়িতে শঙ্খ বাজছে, হচ্ছে উলুধ্বনি। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা আনন্দে লক্ষ্মীমায়ের পূজার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। হঠাৎ তরোয়াল ও অন্যান্য অস্ত্র হাতে অসংখ্য মানুষের দলবদ্ধ চিৎকারে সবাই ভয়ে, আতঙ্কে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। এটাই ছিল হিন্দুদের নোয়াখালিতে শেষ লক্ষ্মীপূজা।

অবিভক্ত ভারতের নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, রায়পুর, ছাগলগঞ্জ, বেগমপুর, সন্দীপ খানা এলাকায় এবং ত্রিপুরা জেলার হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর, ফরিদ গঞ্জ এবং অন্যান্য জায়গায় দেশভাগের দাবিতে এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে হিন্দু নরসংহার হয়েছিল। বলপূর্বক হিন্দুদের মুসলমানে ধর্মান্তরিত, হিন্দু মাহিলাদের ধর্ষণ, মহিলাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা, পুরুষদের গলা কেটে হত্যা করা, হাত পা বেঁধে জলন্ত আগুনে ফেলে জ্বালিয়ে দেওয়া, ঘরবাড়ি, দোকান, জমি জায়গা লুঠ করা এই ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের সৃষ্টিকর্তাদের ও তাদের রাখোয়ালা অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ সুরাবর্দির কাজ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সেই সময় গান্ধীজী নোয়াখালিতে চার মাস ছিলেন শান্তি স্থাপনের জন্য। কিন্তু হিন্দুদের উপর এই ভয়ংকর অত্যাচারে হতাশ হয়ে পড়েন।

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত এই একতরফা অত্যাচার ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দিনটা মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ও মুসলিম মিলিশিয়ারা বেছে নিয়েছিল হিন্দুদের লক্ষ্মীপূজার দিনকে। ১০ অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাতে শ্যামপুর দায়রা শরিফের পিরবংশের উত্তরপুরুষ ও নোয়াখালি কৃষক সমিতির প্রভাবশালী নেতা গোলাম সারোয়ার হুসেইনীর নেতৃত্বে যে একতরফা হিন্দু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল তাতে পাঁচ হাজারেরও বেশি হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল। হাজার হাজার নারীকে ধর্ষণ ও অপহরণ করা হয়েছিল। হাজার হাজার হিন্দুকে জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। পিরবাবা হুসেইনীর নেতৃত্বে জেহাদিরা জমিদার রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর বাড়ি আক্রমণ করে। রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী ছিলেন নোয়াখালি বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং হিন্দু মহাসভার একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তাঁকে ও বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের হত্যা করা হয়। রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং থালায় করে পির বাবা হুসেইনীকে উপহার দেওয়া হয়। তাঁর ১৩ ও ১৫ বছর বয়সি কন্যা দুজনকে ধর্ষণের পর ইসলামে ধর্মান্তরিত করে দুজন হত্যাকারী তাদের জোর করে বিয়ে করে। এই সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ শুরু হয় সাহাপুর বাজার আক্রমণ করা থেকে। তারপর জেহাদিরা হিন্দুমহাসভার নেতা সুরেন্দ্রনাথ বসুর অফিস আক্রমণ করে। তিনি বাধা দিলে তাঁকে অস্ত্রের আঘাতে আহত করে তাঁর হাত পা বেঁধে জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। সুরেন্দ্রনাথ বসুকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন পাশের গ্রামের ডাক্তার রাজকুমার পাল। জেহাদিরা তাঁকেও হত্যা করে।

সমস্ত মন্দির ও বিগ্রহ ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। যারা নিকটবর্তী থানায় আশ্রয় নিয়েছিল তাঁদেরকে মুসলমান পুলিশ জোর করে থানা থেকে বের করে দেয়। বাইরে জেহাদিরাও তাদেরকে অত্যাচার করে ও মারতে নিকটবর্তী মসজিদে নিয়ে গিয়ে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করে। হিন্দুদের নিষিদ্ধ গোমাংস খেতে বাধ্য করে। নোয়াখালির আক্রমণের চরিত্র সাধারণ আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই আক্রমণের পরেই ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়াটা ছিল সময়ের অপেক্ষা। এই আক্রমণই ভারত বিভাজন বাস্তবায়িত হওয়ার পথকে সুগম করলো। এই একমুখী হত্যা, ধর্ষণ, লুঠ, অপহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরণ এবং মন্দির ও বিগ্রহকে ধ্বংস করা ছিল মুসলিম লিগের পরিকল্পিত লক্ষ্য ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য। নোয়াখালীর হত্যাকাণ্ড এক ভয়ংকর নরহত্যা যা ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর ও কলঙ্কজনক দুঃস্বপ্ন। এই অধ্যায় আমাদের পরিকল্পিত ভাবে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রলেপ লাগিয়ে। ধর্মনিরপেক্ষতার মাখন লাগালেও সেই দগদগে ঘা কিন্তু থেকেই গেছে। অনেকেই এই গণহত্যার কথা ভাসা ভাসা শুনেছেন। কিন্তু আশির দশক বা তার পরে যাদের জন্ম তারা কিন্তু এটা জানে না, কারণ আমাদের দেশের অন্যান্য ইতিহাসের মতো নোয়াখালি হিন্দুহত্যার ইতিহাসও গোপন করা হয়েছে।

কাশ্মীরে পণ্ডিতদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিল তার চেয়েও নির্মম এই অত্যাচার। মনে পড়ে যায় চেঙ্গিজ খান ও অন্যান্য বিদেশি আক্রমণকারীদের কথা। কিন্তু এই হানাদারদের, হত্যাকারীদের মাতৃভাষা ছিল অত্যাচারিতদের মতোই বাংলা।

লোভ, ক্ষমতা ও ঘৃণা মানুষকে পশুর থেকে অনেক নীচে নামিয়ে এনেছে। পশুরা ক্ষুধার্ত না হলে হত্যা করে না কিন্তু মানুষ? □

সিংহভাগ

একটি সিংহ, একটি শেয়াল ও একটি গাধা এক গভীর জঙ্গলে বাস করে। তারা তিনজনেই বন্ধুর মতো সেখানে থাকে। একদিন তারা ঠিক করল এবার থেকে একসঙ্গে শিকার করবে। কেননা একসঙ্গে শিকার করলে লাভ হয় বেশি।

সেইমতো সেদিন তারা একসঙ্গে শিকারে বের হলো। শিকারও বেশ ভালোই মিলল। সবাই খুশি মনে ফিরে এল। এবার ভাগ করে খেলেই হবে। সিংহকে শেয়াল ও গাধা বলল, মহারাজ,, আপনি ভাগ করে দিন। আমরা যে যার ভাগ বুঝে নিয়ে চলে যাই।

সিংহ বলল, না না, আমি এসবে নেই। তোমরাই ভাগ করো। গাধার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, দেখো তো, কীভাবে কী ভাগ করা যায়।

গাধা 'যথা আজ্ঞা' বলে ভাগ করতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে সে সমস্ত শিকারকে সমান তিনভাগে ভাগ করে ফেলল। তারপর সিংহ ও শেয়ালকে ডেকে বলল, আমি সমানভাগে ভাগ করে ফেলেছি। নিজের নিজেরটা নিয়ে নিন।

সিংহ তো রেগে আগুন। সে বরাবর বেশি ভাগ পেতে অভ্যস্ত। 'সিংহভাগ' কথাটি তো সেজন্যই এসেছে। তাকে কিনা গাধাটা নিজের ও শেয়ালের সঙ্গে এক গোত্রে ফেলে দিল! অত্যন্ত রেগে গিয়ে সিংহ এক থাবার আঘাতে গাধাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর নখ দিয়ে ফালা ফালা করে ফেলল। বেচারা গাধা সে সমান ভাগে ভাগ করায় কী দোষ হয়েছে তা বুঝতেও পারল না। বেঘোরে সিংহের হাতে প্রাণ হারাল।

এরপর সিংহ শেয়ালকে বলল, ভাই শেয়াল, তুমি এবার ভাগ করে দাও তো। শেয়াল শুনে একটু হাসল শুধু। সবাই জানে শেয়াল খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। সে তো আর গাধার মতো বোকা নয়। গাধার দশা দেখে সে বুঝতে পেরেছে সিংহের মনের ইচ্ছেটা কী।

সে ভাগ করতে গেল। নামমাত্র নিজের জন্য রেখে প্রায় সবটাই সিংহের ভাগে রেখে সিংহকে ডেকে আনল।

সিংহ তো ভাগ করা দেখে খুব খুশি। বলল, বন্ধু, এত সুন্দর ন্যায়বিচার তোমাকে কে শেখাল? তুমি একেবারে ঠিকমতো ভাগ করেছ। কোথা থেকে এরকম শিক্ষা পেলে?

শেয়াল তখন ভয়ে ভয়ে বলল, মহারাজ, গাধার কী দশা হলো তা তো আমি নিজের চোখেই দেখতে পেলাম। অন্য কারও কাছে তো শেখার কিছু নেই। তার দশা দেখেই বুঝতে পারলাম আপনার কাছে ন্যায্য বিচারের মানে কী।

ছোটো বন্ধুরা, বুদ্ধিমানেরা একবার পরিবেশ পরিস্থিতি দেখেই শিখে ফেলে।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

মহাবীর হরিণা বনস্থলী

মহাবীর হরিণা বনস্থলী জাতীয় উদ্যান তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দরাবাদের কাছে বনস্থলীপুরমে অবস্থিত। উদ্যানটি কৃষ্ণহরিণ সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ৩৬০৫ একর এলাকা নিয়ে গঠিত। ১৯৭৫ সালে জৈনপন্থের ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীরের ২৫০০ তম নির্বাণ বার্ষিকী স্মরণে উদ্যানটির নামকরণ হয়েছে। উদ্যানে চন্দনগাছের আধিক্য রয়েছে। চিতাবাঘ, কৃষ্ণসার হরিণ, চিতল হরিণ, বন্যশুয়োর, সজারু, ময়ূর-সহ ১২০ প্রজাতির জীবজন্তু ও পাখি এবং ৩০ প্রজাতির সরীসৃপ রয়েছে। উদ্যানটি হায়দরাবাদ শহর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত উদ্যান খোলা থাকে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৯১

কৃপয়া – দদাতু
দয়া করে — দিন।

কৃপয়া জলং দদাতু।
দয়া করে জল দিন।

অভ্যাসং কুর্মঃ –
কৃপয়া চষকং দদাতু।
কৃপয়া লেখনীং দদাতু।
কৃপয়া পত্রিকাং দদাতু।
কৃপয়া পুস্তকং দদাতু।

প্রয়োগং কুর্মঃ –
স্বয়ং বাক্যাণি রচামঃ
নিজে নিজে বাক্য রচনা করবো।

ভালো কথা

পরিযায়ী পাখি

আমাদের গ্রাম থেকে একটু দূরেই জঙ্গল। আমাদের গ্রামেও অনেক গাছপালা। এমনিতেই গাছে গাছে অনেক পাখি সারা বছর ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু শীত পড়তেই অনেক অচেনা পাখি আসে। আমরা সেগুলোর নাম জানি না। কোনো পাখি সাদা ধবধবে। কোনোটার লেজ খুবই লম্বা। আবার কোনোগুলো নানা রঙের। আমাদের দেখতে খুবই মজা লাগে। গ্রামের শেষ মাথায় একটা বড়ো পুকুর আছে, আমরা সেটাকে বাঁধ বলি, সেখানেও নানা রঙের হাঁস আসে। এবারেও এসেছে। আমার জেঠু বলেন, ওগুলো পরিযায়ী পাখি। ওরা যেখানে থাকে, এই শীতের সময় নাকি সেখানে খুব শীত আর জল জমে বরফ হয়ে গেছে, তাই ওরা আমাদের দেশে চলে এসেছে। শীত চলে গেলে ওরাও চলে যাবে। আমাদের সুজয় স্যার বলেছেন, ওরা আমাদের অতিথি, তাই ওদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।

শ্রীনাথ কুইরি, নবমশ্রেণী, কোটশিলা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ৎ ই জ গ	(১) পা টা উ টা ল ল
(২) শ্ব র ক্তি ঈ	(২) কা লা ভি ক এ ত্তি

২০ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) গিরগিটি (২) নীতিনিষ্ঠ

২০ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) প্রসববেদনা (২) পাষাণপ্রতিমা

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, ই বি, মালদা। (২) সুমন সরকার, গাজোল, মালদহ। (৩) পূজা সরদার, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগনা। (৪) জ্যোতি মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®

EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book & Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

‘গীতানুরাগীদের অভিনব জনসমুদ্রের মাধ্যমে ব্রিগেডের মাঠে সৃষ্টি হতে চলেছে নতুন ইতিহাস’— শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ

প্রভু জগদ্বন্ধু মহাউদ্ধারণ মঠের সচিব শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ গীতা জননীর শ্রীচরণে নিবেদিতপ্রাণ একজন সন্ন্যাসী। উত্তর কলকাতায় মানিকতলা-স্থিত মহাউদ্ধারণ মঠকে কেন্দ্র করে তাঁর মানব সেবা এবং হিন্দু জাগরণের কাজের সঙ্গে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিচিত। কৃষ্ণনাম স্তব, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর মহারাজকে স্মরণ-সহ মানুষের সুখে- দুঃখে, বিপদে আপদে তিনি সদা তৎপর। সনাতন সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক গঠিত ‘পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ আয়োজন কেন্দ্রীয় সমিতি’র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ। এই সমিতির আয়োজনে ৭ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে’ গীতাপাঠ। স্বস্তিকা পত্রিকার পক্ষে অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের বিষয়ে তাঁর সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন।— স্বঃ সঃ

☐ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ‘পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে সমবেত গীতাপাঠ’ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য যদি একটু সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন।

● আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী। আমরা সকলেই গীতাপ্রেমী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে ভালোবাসি। এই রাজ্যের মাটির বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে হলে ফিরে দেখতে হবে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল পীঠস্থান হলো এই বঙ্গভূমি। গীতার বাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বঙ্গের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। গীতা হলো বঙ্গজীবনের অন্যতম মূল স্তম্ভ। প্রত্যেক বিপ্লবীর কাছে অন্য কিছু না থাকলেও একটি করে ‘গীতা’ অবশ্যই থাকত। গীতাপাঠ ও গীতার বাণী উপলব্ধি হলো সনাতনীদের একত্রীকরণের সর্বোত্তম উপায়। ‘গীতা’ সকল সনাতনীর কাছে মাতৃস্বরূপা। মা জননী যেমন তাঁর সন্তানদের আগলে রাখেন, সকল বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করেন, সদাসর্বদা সাহস-ভরসা দেন, ‘গীতা’ মা আমাদের প্রতি সেই কাজটিই করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে হিন্দুরা, যেভাবে তাঁরা নিজদেশে পরবাসী হয়ে পড়েছেন এবং প্রায় কাশ্মীরের মতো অবস্থা হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষত সনাতনীরা যেভাবে এ রাজ্যে নানাভাবে আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, সেই কারণে সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠই হয়ে উঠতে পারে এই ঘোরতর বিপদ হতে মুক্তির উপায়। এমতাবস্থায় আমরা সকলে গীতা মায়ের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সকল সনাতনীর প্রিয় গ্রন্থ হলো গীতা। ‘গীতা’ এমন একটি গ্রন্থ যে গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো বিতর্ক নেই। গীতা হলো— মানবধর্মশাস্ত্র। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে-— জগতের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে নিয়মাবলী বা ম্যানুয়াল প্রয়োজন, সেটি গীতায় বর্ণিত হয়েছে। গীতাপাঠের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান কোনো বিভেদ নেই। জাতি-বর্ণ-উপাসনা বিধি নির্বিশেষে ধরিত্রীর সকল মানুষের চিরকালীন জীবন পদ্ধতি হলো ‘গীতা’। তাই গীতাপাঠকে সকলে যদি ধ্যান-জ্ঞান মনে করে, গীতা পাঠকে অভ্যাসে পরিণত করে, গীতাপাঠের মাধ্যমে সকলে যদি গীতার বাণী উপলব্ধি করে এবং গীতার আদর্শ অনুসরণ করে যদি সকলে পরিচালিত হয় তবে সনাতনী সংস্কৃতি, সনাতন ধর্ম রক্ষা পাবে। এই প্রক্রিয়ায় ভারতবর্ষের যে মূলস্রোতধারা, সেই ধারা হতে কেউই বিচ্ছিন্ন হবে না। সকলেই সেই স্রোতধারার সঙ্গে চলতে সক্ষম হবে। এর ফলে সমস্ত সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হবে। হিন্দুসমাজ ছাড়াও সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়াটি প্রযোজ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। গীতার আশ্রয় গ্রহণ করলে হিন্দুসমাজ-সহ সকল সম্প্রদায় সবরকম সমস্যা হতে মুক্তিলাভ করবে। যুদ্ধক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করে ধর্মোপদেশ গীতা প্রসারিত হয়েছে সর্বত্র। এই জ্ঞান নিত্য, শাশ্বত। নৈতিকতার শিক্ষাদানে গীতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ‘গীতা’ হলো বিশ্বজনীন গ্রন্থ। এই কারণে সকলকে আহ্বান করছি গীতার আলোকে আলোকিত হওয়ার।

☐ ‘লক্ষ কণ্ঠে’ গীতাপাঠ এ বছর পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই কার্যক্রম শুরুর প্রেক্ষাপটটি কী?

● প্রথমে ইসকনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় ‘পাঁচ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠ’। ২০২২-এর ৫ ডিসেম্বর শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীপাদ জগদার্তিহা দাস প্রভুর উদ্যোগে শুরু হয় এই মহতী কার্যক্রম। সনাতন সংস্কৃতি সংসদের

ফঃ ৬

উদ্যোগে ২০২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয় 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২০২৪-এর ২৫ মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ফরাসডাঙ্গার মাঠে আয়োজিত হয় 'সনাতন মহা সম্মেলন' এবং ৫০ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠ। এছাড়াও গত বছর ১৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে আয়োজিত হয় গীতাপাঠের অনুষ্ঠান। সেই কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে গত ২৪ আগস্ট মালদহ শহরের সিঙ্গাতল টাউন স্কুল মাঠে আয়োজিত হয় 'সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ'-এর কার্যক্রম। আপনাদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ (২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ; কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি, রবিবার) পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম 'পাঁচ লক্ষ সম্মিলিত কণ্ঠে' ধ্বনিত হতে চলেছে গীতার বাণী।

□ এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরূপে আমন্ত্রিত সাধুসন্তদের সম্পর্কে যদি একটু আলোকপাত করেন।

● 'পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে সমবেত গীতাপাঠ' অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন গীতা মনীষী, মহামণ্ডলেশ্বর পূজ্যস্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন বৃন্দাবন ধাম বাৎসল্য গ্রামের প্রতিষ্ঠাত্রী, পদ্মভূষণ সাধ্বী ঋতম্ভরা (দিদি মা) এবং সম্মাননীয় অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন পরমপূজ্য যোগঋষি শ্রীরামদেব বাবা। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন বাগেশ্বরধাম সরকার পূজ্য ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহারাজ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই অনুষ্ঠানের সভাপতি রূপে থাকবেন গীতা মনীষী। কুরুক্ষেত্র ও বৃন্দাবনে তাঁর আশ্রম রয়েছে। তিনি গ্রহণ করেছেন একাধিক গীতা-আধারিত প্রকল্প। তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হতে চলেছে 'গীতা মিউজিয়াম'। নিঃস্বার্থভাবে সেবাকাজ ছাড়াও তিনি পৃথিবীময় গীতার বাণী প্রচার করে চলেছেন। পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যক্রমে আগতদের মধ্যে যত গীতা বিতরণ করতে হবে, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনিই বহন করছেন। বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি নির্বিশেষে সকল সনাতনীর সমাগম ঘটবে এই অনুষ্ঠানে। এই মহতী কার্যক্রমে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ বহু মানুষ গ্রহণ করবেন। এবারের জনসমাগম 'পাঁচ লক্ষ'ও অতিক্রম করতে পারে বলে সকলেই আশাবাদী। বিভিন্ন মঠ-মন্দির ও সম্প্রদায়ের প্রায় দু'হাজার সাধুসন্ত এই অনুষ্ঠানে ইতিমধ্যেই আমন্ত্রিত। প্রত্যেকের জন্য কার্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে সেই সব কার্ড বিতরণের কাজ চলছে। যদি কোনো সাধুসন্ত কোনো কারণে কার্ড না পেয়ে থাকেন, তবে তাঁদের জন্যও আসনের ব্যবস্থা করা হবে। অনুষ্ঠানের দিন মোট তিনটি মঞ্চ হবে— পার্থসারথি মঞ্চ (এটিই হবে মূল মঞ্চ), জগদ্গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের মঞ্চ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের মঞ্চ। এই তিনটি মঞ্চে সাধুসন্তরা থাকবেন। এই মঞ্চগুলিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা থাকবেন না। কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য এই অনুষ্ঠানে কেউ রাখবেন না। তাই ভারতের সকল সাধুসন্তদের কাছে আমাদের আবেদন, সকলে এসে এই কর্মযজ্ঞটিকে তাঁরা সার্থক করে তুলুন। 'হে পার্থসারথি! বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ'— এই নজরুলগীতিটিও অনুষ্ঠানমঞ্চ হতে পরিবেশিত হবে।

□ এই কার্যক্রম আয়োজনের ক্ষেত্রে 'পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ আয়োজন কেন্দ্রীয় সমিতি' এবং 'সনাতন সংস্কৃতি সংসদ' কী কী বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছে?

● এখনও কোনো বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন সমিতিকে হতে হয়নি। আশার কথা এই যে, রাজ্য সরকার সমিতিকে কোনো সহযোগিতা না করলেও বিরোধিতাও করেনি। অন্তর থেকে এহেন কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণ হয়তো চাইছে না পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কিন্তু প্রকাশ্যে তারা সেসব কিছু বলছে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও গতবার ই-মেইল করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যুত্তরে সেই ই-মেইলের প্রাপ্তিস্বীকারও করেন। 'নিমন্ত্রণ পেয়েছি। আমি বিষয়টি দেখব।'--- এই কথা বলেছিলেন তিনি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-সহ অসংখ্য সংগঠন এই কর্মসূচি রূপায়ণে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছে। সনাতনীরা ২০২২ থেকেই এই লক্ষ্যপূরণে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, এবারও পড়বেন। সুষ্ঠুভাবে, নির্বিঘ্নে এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা অবশ্যই সম্ভবপর হবে। এই অরাজনৈতিক কার্যক্রমে সকলকে সাদর আমন্ত্রণ। গীতা জননীর আশীর্বাদ সকলের উপর থাকবে।

□ এই বছর 'পাঁচ লক্ষ সনাতনী'র কণ্ঠে সমবেত গীতাপাঠ কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা কী?

● 'গীতা' এমন একটি শাস্ত্র, যা মনুষ্য জীবনযাত্রার পথে যতরকম বাধাবিঘ্ন আসতে পারে, তার সমাধান উপস্থাপনা করেছে। মানব জীবনে আহার-বিহার, লোকব্যবহারের স্বরূপ উপস্থাপনা করেছে গীতা। অর্থাৎ একটি ব্যালেন্সড্ (ভারসাম্যযুক্ত) জীবন পদ্ধতির সন্ধান গীতার মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি। এই জীবনের মধ্যে যে সুপ্ত দেবত্ব রয়েছে, সেই দেবত্ব আমরা জাগ্রত করব গীতাপাঠের মাধ্যমে। মানুষের মধ্যে একাধারে পশুত্ব, মানবত্ব ও দেবত্ব বিরাজমান। প্রথম পর্যায়ে পশুত্ব থেকে মানবত্বে উত্তীর্ণ হতে হবে। এর পরবর্তী পর্যায়ে ঘটবে মানবত্ব হতে দেবত্বে উত্তরণ। এরপর রয়েছে ঈশ্বরত্ব। এই উত্তরণের পর্যায় সমূহ সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাদান করে থাকে গীতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘজীবন সকলের কাছেই একটি আদর্শ জীবন-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে সকলের শোনা উচিত। তাঁর জীবনের কথা, তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী যদি সকলেই শোনেন, তবে সকলেই পাবেন অমৃতের সন্ধান। আমার গুরুদেব ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ বলতেন, 'ধরা যাক, কেউ একটি মন্দিরে যাচ্ছেন, কিন্তু পথ চিনতে পারছেন না। কেউ বলছেন এ পথে যান, কেউ বলছেন ও পথে যান। মন্দিরের মহারাজের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হবে, তখন কি অন্য কারুর কাছে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে যে, মন্দিরে যাওয়ার পথ কোথায়?' শ্রীভগবানের কাছে আমরা সকলেই যেতে চাই। এক-এক শাস্ত্র এক- এক ভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করছে; তাঁকে পাওয়ার পথের সন্ধান দিচ্ছে। শাস্ত্রকাররা

কেউ বলছেন উপবাস করো, কেউ তীর্থযাত্রার উপদেশ দিচ্ছেন, কেউ-বা বলছেন দান করো, কেউ বলছেন যোগসাধনা করো। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'অর্জুন, তুমি আমাকে পেতে চাও— এই তো আমি এসেছি। আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করো, সমর্পণ করো, তোমার সমস্ত সমস্যার সমাধান আমি করে দেবো। তুমি জীবনে শান্তি পাবে।' এর থেকে বড়ো আশ্বাসবাণী আমরা কোথায় পাব? মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতে গীতা বিবৃত করার পর গীতামাহাত্ম্যে বলেছেন—

'গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।।'

বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে 'বাল্মীকি উবাচ', 'ঋষি উবাচ' অথবা 'বেদব্যাস উবাচ'। গীতা একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থ যেখানে স্বয়ং শ্রীভগবান কথা বলছেন। একমাত্র গ্রন্থ যেখানে উল্লেখিত হয়েছে 'শ্রীভগবানুবাচ'। মহানামব্রতজী রচিত 'গীতার ধ্যান' গ্রন্থটি সকলে একটু পাঠ করবেন। এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অতি সুন্দর, মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে, যা পাঠ করলে যেন একজন সাধারণ মানুষও মহাপুরুষের স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারেন। গ্রন্থটি পাঠ করলে মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত সুপ্ত দেবত্ব জাগৃত হবে।

পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে সমবেত গীতাপাঠের কার্যক্রমে সনাতনীরা পাঠ করবেন গীতার প্রথম অধ্যায়— 'অর্জুনবিষাদযোগ', নবম অধ্যায় --- 'রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ' (গীতাকে যদি একটি মালারূপে কল্পনা করা হয়, তবে মালার মধ্যস্থানে অবস্থিত লকেটটি হলো নবম অধ্যায়) এবং অন্তিম অধ্যায়, অর্থাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়--- 'মোক্ষসন্ন্যাসযোগ'। অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জুন অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি নিঃসংশয় হয়েছেন, অতএব তিনি শ্রীভগবানের সব আজ্ঞা পালন করবেন। ঠিক সেই ভাবটির অনুসরণে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উত্তরণের আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। এই প্রক্রিয়ায় সকল সনাতনীর একত্রীকরণ সম্ভবপর হবে। আমরা মনে করি, পৃথিবীর সকল সনাতনী এক। যাঁরা অন্যান্য উপাসনাপদ্ধতি অনুসরণকারী, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, তাঁরাও কিন্তু আজ সনাতনী আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে শুরু করেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে সনাতনী আলো গীতার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। গীতা আমাদের সকলের মাতৃস্বরূপা। গীতা মা যদি সনাতনীদের মাথার উপরে থাকেন, তবে

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।" *(গীতা, ১৮/৭৮)*
।। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে — গীতা পাঠ ঘরে ঘরে।।

যুগাব্দ - ৫১২৭ **বঙ্গাব্দ - ১৪৩২**

পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ

পশ্চিমবঙ্গ তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত পবিত্রভূমি যা ভারতের একটি অন্যতম প্রধান রাজ্য এবং অতীতের ভারতভূমির একটি প্রধান ভূখণ্ড যা সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য বহন করে আসছে।

এই পবিত্র বঙ্গভূমি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের মতো আরও অনেক ধর্মপ্রাণ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জন্ম ও কর্মভূমি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের এই পবিত্রভূমির অবস্থা সংকটাপন্ন।

আমরা আমাদের গৌরবময় অতীতকে ভুলে গিয়েছি। এমতাবস্থায় আমাদের অদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা অত্যন্ত চিন্তিত। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র 'গীতা'র শরণাপন্ন হলেই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারে।

তাই বর্তমান সময়ের আহ্বানে, সমবেত ভাবে সকল মঠ-মন্দির, আশ্রম, বিবিধ সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্যক্তিবর্গ তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার গীতানুরাগী 'পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ' অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চলেছেন।

সকল সনাতনী গীতানুরাগীদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারা সক্রিয়ভাবে এই ভব্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদান করে এই ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন।

(সকলকে শঙ্খ হাতে, সাদা বস্ত্র/লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পরে অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।)

স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ
(সভাপতি, পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ আয়োজন কেন্দ্রীয় সমিতি, সনাতন সংস্কৃতি সংসদ)

আমাদের সকলের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কোনো ভয় বা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হবে না। গীতা মা-ই জীবনের সকল বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ করবেন। গান্ধীজীও বলেছিলেন যে, তাঁর মা যখন প্রয়াত হন, তখন তিনি খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শোকবিহ্বল অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধারে গীতা মা সহায়ক হয়েছিলেন। গীতা মায়ের আশ্রয়ে তিনি শান্তিলাভ করেছিলেন। তাই সকলে আসুন, গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মহতী যজ্ঞে আমরা অংশগ্রহণ করি। এই কর্মযজ্ঞের দিন, অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে দুপুর দু'টো পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান হবে। সেখানে পূজন, সংগীত পরিবেশন, ভাষণ, গীতার উপর প্রদর্শনী সবকিছুই আয়োজিত ও অনুষ্ঠিত হবে। সেই মেলার মধ্যে একটি নতুন জীবন আমরা দেখতে পাব। ভক্তরা ছাড়াও সেখানে সমাগম ঘটবে সাধুসন্তদের। এই কার্যক্রম উপলক্ষ্যে প্রায় ২০০০ সাধুসন্তের সমাবেশ ঘটবে। সেদিন তাঁদেরও সেবা ও পূজন হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকেই বিনামূল্যে গীতা প্রদান করা হবে। সকলের জন্য পানীয় জল-সহ সামান্য জলখাবার আয়োজনেরও প্রয়াস চলছে। সকলের সহযোগিতা সমিতি কামনা করছে। সকলের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনারা নিজ দায়িত্বে ও খরচে কার্যক্রমে আসবেন এবং গীতাপাঠে যোগ দেবেন। কারণ এই ক্ষেত্রে সকলকে আর্থিকভাবে সাহায্য দান সমিতির পক্ষে কঠিন। শোনা যায়, ব্রিগেডে ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিবুর রহমানের জনসভায় বহু লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়েছিল। সেখানে এই বিরাট ব্রিগেড মাঠে সহজেই পাঁচ লক্ষ লোক অবস্থান করতে পারবে। ২০২৩ সালে ব্রিগেডে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের জনসমাবেশ হয়। এবারও পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষের সমাগম হতে চলেছে। সকলের সহযোগিতা এই বিষয়ে প্রার্থনা করি। এটি শুধুমাত্র কয়েকজন সাধুসন্তের উদ্যোগে সংঘটিত হচ্ছে বলে তাঁদেরই সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তা নয়। গীতাপাঠের এই কার্যক্রমকে সার্থক করে তোলার বিষয়টি হলো সমগ্র সনাতনী সমাজের সম্মিলিত দায় ও দায়িত্ব। সকলের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা সকলে তন-মন-ধন (শরীর-হৃদয়-অর্থ) সমর্পণ করে এই কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। সকলের প্রতি আমাদের প্রণাম, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রইল। জয় গীতা।

□ কলকাতা বা শিলিগুড়িতে যে অনুষ্ঠান হয়, সেই কর্মসূচিতে 'এক লক্ষ' বা লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের জন্য মানুষকে আহ্বান করা হয়। এই বছর 'পাঁচ লক্ষ' কণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ কী? এই সংখ্যাবৃদ্ধির যে আহ্বান তার বিশেষত্ব কী?

● এই মহতী কার্যক্রমে আরও বেশি সংখ্যক সনাতনীদের যুক্ত করাই হলো লক্ষ্য। সব সনাতনীর বাড়িতেই গীতা রয়েছে এবং তাঁরা অনেকেই নিয়মিত গীতাপাঠ করে থাকেন। কিন্তু সকলে মিলে একত্রে গীতাপাঠ করতে পারলে হিন্দু শক্তির একটি সার্থক প্রদর্শন সম্ভব হবে। অনেকে বলেন, পৃথিবীতে ৭০০ কোটি মানুষের মধ্যে ২০০ কোটি ইসলাম অনুসারী রয়েছেন। তাদের জন্য ৫৬টি দেশ রয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় ১০০ কোটি খ্রিস্টান রয়েছে। তাদের জন্যও প্রায় ১০০টি দেশ রয়েছে। বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের জন্যও ১০টি দেশ রয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বে সনাতনীদের সংখ্যা ১০০ কোটির বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নিজস্ব কোনো দেশ নেই। অন্যান্য উপাসনাবিধি অনুসরণকারী বা মতাবলম্বীরা সনাতনীদের উদ্দেশে বলে থাকেন যে, তোমরা সনাতন দেশ বা হিন্দুরাষ্ট্র করছ না কেন? কেউ তো তোমাদের বাধা দেয়নি। তাঁরা হয়তো ঠিকই বলেছেন। মূল সমস্যা হয়তো রয়েছে হিন্দুদের মধ্যেই। হিন্দুরাই হয়তো চায় না পরিচিতি লাভ করুক হিন্দুরাষ্ট্র। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে হিন্দু সংহতি যে কত প্রয়োজন তা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের বীভৎস ঘটনাগুলি। চারিদিকে এই জেহাদিদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। যারা হিন্দুদের ঘরে আগুন দেয়, হিন্দুধর্মকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, হিন্দুদের আরাধ্য দেবদেবীদের মূর্তি ভেঙে দেয়, সনাতনীদের শোভাযাত্রায় গুলি চালায়, বোমা, ঢিল ও পাথর ছোঁড়ে— এই সমস্ত অশুভ শক্তিও কিন্তু ভয় পাবে যদি সনাতনীরা একত্রিত হয়ে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ করে। এই প্রক্রিয়ায় হিন্দুদের শক্তি প্রকাশিত হবে। সেই শক্তি দেখে সকলে সমীহ করবে। কারণ 'সঙ্ঘে শক্তি কলৌযুগে'। একটি ছোটো তৃণ, সেটিকে একটি ক্ষুদ্র বালকও নিমেষে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু সেই তৃণখণ্ডগুলি শুকিয়ে যদি শক্ত দড়ি বানানো যায়, সেই মোটা দড়ি দিয়ে বিশাল, মত্ত হাতিকেও কিন্তু বেঁধে রাখা যায়। অশুভ শক্তির নিয়ন্ত্রণে আজকের সমাজটাও যেন মত্ত হাতির মতো হয়ে গিয়েছে। সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে এই অশুভ শক্তি উদ্যত হয়েছে। আমরা চাই, সব সনাতনী সঙ্ঘবদ্ধ হোক। ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে তাঁরা আত্মরক্ষার উপায় অনুসন্ধান করুক। 'সঙ্ঘে শক্তি কলৌযুগে'— বাক্যটি মূর্ত হয়ে উঠুক। এই মহতী কার্যক্রমে আরও আরও মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সনাতনীদের শক্তি সমগ্র জগৎ দেখুক।

□ কার্যক্রমের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে হিন্দুসমাজের প্রতি কোনো আবেদন বা পরামর্শ?

● আমরা বলব যে, সনাতনীরা যে যেখানে রয়েছে, তাঁরা যদি এই কার্যক্রমে আসতে পারেন বা না পারেন, যদি তাঁরা ওই সময় ঘরেও থাকেন, ওই সময়টা আপনারা গীতাপাঠ করবেন। গীতাপাঠ করলে দেখবেন মনে পরম শান্তি লাভ করবেন। মনে হবে যে, একটি ঐশ্বরিক শক্তি দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে। গীতার মন্ত্রগুলি মনে হয় যেন জীবন্ত এক একটি শক্তি। নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেছেন— 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।' এছাড়াও তিনি বলেছেন, 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।' —শ্রীভগবানের এই যে এত প্রেম, এত দরদ, এত ভালোবাসা অর্জুনের প্রতি যে, অর্জুনকে তিনি বলছেন, 'অর্জুন আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে পুনরায় এই উপদেশ দান করছি। এই উপদেশগুলি অতি পুরাতন। অতীতে অনেককে বলেছিলাম। তোমাকে আবার বলছি। সেই পুরনো কথাগুলি হারিয়ে যায়।' তাই শ্রীভগবান বার

বার অবতীর্ণ হন এবং এই চিরন্তন, শাশ্বত কথাগুলি বলে যান। তাই এই গীতার বাণী চির নবীন, চির নতুন এবং মানব জীবনের চিরকালীন সঙ্গী। তাই গীতা মা-কে নতুন করে চিনব আমরা। আসুন, আগামী ৭ ডিসেম্বর, বিগ্রেডের মাঠে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের সমাবেশে। প্রত্যেককে আমরা আহ্বান করছি— সব বাধা উপেক্ষা করে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ নির্বিশেষে আপনারা সবাই আসুন। আপনাদের সকলের জন্য গীতা, প্রত্যেকের মা হলেন গীতা। ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যা অন্য কোনো দেশকে কোনো দিন আক্রমণ করেনি। অন্যান্য মত-পথ, উপাসনাপদ্ধতিকে নিন্দা করেনি। এই মহান দেশ সকলকেই বুকে টেনে নিতে চেয়েছে। তাই গীতার মাধ্যমে যেন সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষকে একত্রিত করে এই ভারতবর্ষকে এক 'নতুন ভারতবর্ষে' আমরা পরিণত করতে পারি। পুনরায় ভারতবর্ষ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করবে। সমস্ত মানুষের অন্তরে অন্তত শান্তি বিরাজমান থাকবে— এই বার্তাটিই আমরা পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ কার্যক্রমের মঞ্চ হতে দিতে চাই।

□ গীতা পাঠের এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আগামীদিনে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের কী পরিকল্পনা রয়েছে?

● আমরা চাইছি প্রতি বছরই এই কার্যক্রমকে চালিয়ে যেতে। এখন রাজ্যের সর্বত্র এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আনন্দের সংবাদ যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে আমরা যাচ্ছি। প্রতিদিন তিনটি-চারটি স্থানে আমরা যাচ্ছি। প্রতিদিনই দু'টি-তিনটি স্থানে সভা হচ্ছে এবং সেখানে অসংখ্য মানুষ গীতাপাঠ করছে। এত মানুষ আমাদের ডাকছেন যে, সর্বত্র আমরা পৌঁছাতে পারছি না। সাধারণ মানুষের মধ্যে গীতা বিষয়ক এই চেতনা সত্যিই অসাধারণ ও অভূতপূর্ব। এমনকী বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে এই আবেগের স্রোত। বাংলাদেশে ঢাকার কাছে চাঁদপুর নামক একটি স্থান থেকে ১৪৪ জনের একটি তালিকা এসেছে। তাঁরা নিষ্ঠাভরে গীতা বিষয়ক চর্চা করে থাকেন। এই ১৪৪ জনের ভিসা মঞ্জুর করেছে ঢাকা-স্থিত ভারতীয় হাইকমিশন। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আরও অনেক ব্যক্তি পাসপোর্ট-ভিসার মাধ্যমে এদিনের কার্যক্রমে যোগ দিতে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতে যে সাতটি রাজ্য রয়েছে, এবং তার সঙ্গে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা— এই ১০টি রাজ্য হতে অগণিত সাধুসন্ত ও গীতাপ্রেমী আসবেন। এঁরা সকলেই মহতী কার্যক্রমে যোগদান করবেন। এই জনসমাগম আমাদের এক পরম প্রাপ্তি। 'পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ'-এর এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নয়, এটি সমগ্র পূর্ব ভারতের সামগ্রিক অনুষ্ঠান। সমস্ত রাজনৈতিক দলের সাংসদ, বিধায়ক এবং কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের সব মন্ত্রীদের প্রত্যেককেই আমরা আমন্ত্রণ জানাব, তাঁরা যেন আসেন।

□ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই মহতী কার্যক্রম কী ধরনের বার্তা বহন করবে?

● এতকাল আমরা দেখেছি যে, ব্রিগেড বড়ো বড়ো, গরম গরম রাজনৈতিক বক্তব্য রাখার জায়গায় পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু গত ২০২৩ সালে এবং এবার দেখা যাচ্ছে অন্য পরিস্থিতি। তার ফলে নিজের একটি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে ব্রিগেড। অন্যরূপে সজ্জিত হতে চলেছে ব্রিগেড। ১ ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তীর দিন ব্রিগেড ময়দানে 'খুঁটি পূজা' অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সমস্ত তীর্থের মাটি ও জল আসবে, এবং এক হাজার কলস গঙ্গাজল দিয়ে সমগ্র ব্রিগেড ময়দান ধৌত করা হবে। পুরীধাম-স্থিত জগন্নাথদেবের মন্দির থেকে প্রসাদী ধ্বজ আসবে। ব্রিগেড ময়দানে সেই ধ্বজ আমরা উত্তোলন করব। এতদ্বারা ব্রিগেডের বাতাবরণটি পরিবর্তিত হয়ে গীতাপাঠের অনুকূল হবে। গীতায় উল্লেখিত হয়েছে— 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।' —ধর্মভূমিস্বরূপ এই নতুন কুরুক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত এই মহামিলনে সকলের মধ্যে সাধিত হবে এক মহান মেলবন্ধন। এটিই হচ্ছে এই মহতী কার্যক্রমের মূল বার্তা। সমস্ত মানুষ অনুধাবন করবে যে, 'রাজনীতি' আমাদের সকলের জন্য নয়। 'রাজনীতি' হলো রাজার নীতি। রাজা যদি সঠিক ধর্মপথে থাকেন, তাহলেই কিন্তু দেশ ভালোভাবে পরিচালিত হবে, দেশে সুশাসন বিরাজ করবে। রাজা যদি ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করেন, তাহলে কিন্তু দেশ চলে যাবে অশান্তির করালগ্রাসে। তাই আমরা সকলে চাই, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা প্রত্যেকে এই রাজধর্মটা পালন করুক। যাঁরা প্রশাসনে রয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি একটি অনুরোধ রয়েছে। রাজা বা শাসক যেমন প্রত্যেকের থেকে অল্প অল্প কর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় কাজে সেই অর্থ ব্যয় করেন এবং বিভিন্ন সমস্যার নিরসন করেন, তেমনই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী প্রত্যেককে সমান মর্যাদা দিয়ে, প্রতিটি মানুষই তাঁর নিজের সন্তান— এই মনে করে মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যদি দেশের নাগরিকদের নিজ সন্তানজ্ঞানে প্রতিপালন করেন, তবে সেটিই হবে 'রাজধর্ম' পালনের পরিচায়ক। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য বিধর্মীদের সঙ্গে কোনো বিরোধ নয়। শুধু সকলের উদ্দেশ্যে অনুরোধ, তারা সনাতন ধর্মের অনুসারী হোন বা না হোন, এই ধর্মের ক্ষতি করা থেকে তারা যেন বিরত থাকেন। সনাতন ধর্মের নিন্দা যেন তারা না করেন। সনাতন ধর্ম-সহ প্রতিটি মত-পথ ও উপাসনাপদ্ধতির অনুসারীদেরই অধিকার রয়েছে নিজস্ব ধর্ম ও উপাসনাবিধি পালনের। গীতা পাঠের কার্যক্রমের মাধ্যমে সনাতনীরা তাঁদের ধর্ম পালন করছে। তাঁরা অন্যদের কোনো নিন্দা করছে না। কোনো রাজনৈতিক দলকেও তাঁরা নিন্দা করছে না। তাঁরা চায় সকলেই এখানে যুক্ত হোক। এই দেশের সকলেই আমরা এক মঞ্চে এসে, এক সুরে কথা বলি। রাষ্ট্রহিত সর্বোপরি। সেই উদ্দেশ্যে দেশ, জাতি, সমাজ ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তবেই আমাদের দেশ এবং আমাদের রাজ্য স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবে। সপরিবারে ও সবান্ধবে এই ভব্য অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য সকল দেশবাসীকে আন্তরিক অনুরোধ জানাই। এই অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে প্রার্থনা করি। গীতানুরাগীদের এই অভিনব জনসমুদ্রের মাধ্যমে ব্রিগেডের মাঠে সৃষ্টি হতে চলেছে নতুন ইতিহাস।

আফগানিস্তানে হিন্দু-শিখদের যে প্রয়োজন তা বুঝেছে তালিবান সরকার

মণীন্দ্রনাথ সাহা

গান্ধার প্রদেশের রাজা সুবলের জ্যেষ্ঠ পুত্র শকুনি সহোদরা গান্ধারীকে অতি স্নেহ করতেন। কারণ তিনি রূপসী, বিদুষী ও ধর্মনিষ্ঠ। রাজজ্যোতিষী গান্ধারীর অকালবৈধব্যের ভবিষ্যদ্‌বাণী করলে, একটি ছাগলের সঙ্গে গান্ধারীর বিয়ে দিয়ে ছাগলটিকে মেরে তাঁর কপালদোষ খণ্ডন করা হয়। এই সেই গান্ধার, যা লোকমুখে গান্ধাহার এবং পরে কান্দাহার হয়, যা অধুনা আফগানিস্তানের একটি প্রদেশ।

হস্তিনাপুরের বহুদূরে ক্ষুদ্র রাজ্য গান্ধারের রাজকন্যা গান্ধারী স্বয়ংবর সভায় ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর যোগ্য পাত্র রূপে নির্বাচিত করেন। কিন্তু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অমত পোষণ করেন তাঁর পিতা ও ভ্রাতারা। বিষয়টি জানতে পেরে গান্ধার রাজ্য আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পিতামহ ভীষ্ম। গান্ধাররাজ বুঝলেন, এই অসম বিয়ে মেনে না নিলে গান্ধার দেশে পরাক্রমশালী ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন, তাই রাজি হলেন। বিয়ের পর তাঁর রূপ, শিক্ষা, বুদ্ধি স্বামীকে ছাপিয়ে না যায় এবং তা দেখতে না হয়, তাই নিজের চোখ আজীবন বেঁধে রাখলেন। গান্ধারী 'মাঙ্গলিক' হওয়ার কারণে তাঁর প্রথম বিবাহের ইঙ্গিত ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গোপন করেন গান্ধাররাজ। কিন্তু ভীষ্ম অচিরেই জানতে পারলেন, রাজজ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণী, গান্ধারীর সঙ্গে ছাগলের বিবাহ ও বৈধব্য যোগ। এই সত্য রাজা সুবল, রাজপুত্র শকুনি গোপন করায়, ভীষ্ম আক্রমণ করলেন গান্ধার রাজ্যকে।

রাজা সুবল, শকুনি ও তাঁর অজস্রভ্রাতা, আত্মীয় বন্দি হলেন। বন্দি শিবিরে ধর্ম মেনে, সব বন্দিকে একটি করে ভাতের দানা খেতে দেওয়া হতো। কিন্তু সবাই সেই ভাত, রাজপুত্র শকুনিকে দিয়ে দিতেন, যাতে প্রতিশোধ নিতে শকুনি বেঁচে থাকেন। শকুনি কুরুবংশ ধ্বংস করার শপথ নিয়েছিলেন।

বাকিটা সবাই জানেন। যুদ্ধের পরে গান্ধারীর অভিশাপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এই সেই গান্ধার বা আফগানিস্তান, যে ভূখণ্ড গ্রিকযোদ্ধা আলেকজান্ডার দখল করলেও বেশিদিন বাঁচাতে পারেননি। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে, মৌর্যবংশ এখানে রাজত্ব করলেও বেশিদিন টেকেনি। পরে বৌদ্ধমত প্রচার হলেও তা বিলীন হয়ে যায়। ইংরেজরা ভারত দখল করলেও আফগানিস্তান দখলে রাখতে পারেনি। রাশিয়া দখল নিয়েও শান্তিতে থাকেনি। আমেরিকা তো আফগানিস্তানে আরেক ভিয়েতনাম সৃষ্টি করেছিল। আমেরিকা সে কাজে পাকিস্তানের সহযোগিতা পেয়েছিল।

সুপ্রাচীন গান্ধার সভ্যতার পীঠস্থান আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন হয়ে তালিবান গোষ্ঠী রক্তের স্বাদ পেয়ে গুরুমারা বিদ্যা আয়ত্ত করে আমেরিকাকেই ছোবল মারল। কারণ তখন পাকিস্তান আর তালিবানে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শুধু আমেরিকাকে নয়, তারা যৌথভাবে কাশ্মীরে অঘোষিত জেহাদ চালিয়েছিল। মেরেছিল হিন্দুদের, মেরেছিল সন্ত্রাসবিরোধী মুসলমানদের। তাদের হাতে রেহাই পায়নি নিরীহ হিন্দু নারী-শিশু-তীর্থযাত্রীরাও। ভারতকে বিব্রত করার এক অভুতপূর্ব আনন্দ উপভোগ করতে থাকে দুই বন্ধুদেশ। অবশ্য পরবর্তীতে তালিবানরা আফগানিস্তানের ওপর ক্ষমতা হারায়।

দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর পর ২০২১ সালে আবার ক্ষমতায় আসে তালিবান সরকার। ভারত এখনো তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিলেও কাবুলে পুনরায় দূতাবাস চালু করেছে। হঠকারী সিদ্ধান্ত যে সবসময় দেশ শাসনে ফলদায়ক হয় না তা এতদিনে বুঝতে পেরেছে তালিবান সরকার। তারা বুঝতে পেরেছে, দেশের মানুষের জনসমর্থন না পেলে যেমন দেশ শাসন কঠিন তেমনি বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষের প্রয়োজনও রয়েছে। উপরন্তু ভালো প্রতিবেশীর সাহায্য যে সবসময় প্রয়োজন তা তাদের বোধগম্য হয়েছে। তারা আরও বুঝতে পেরেছে তালিবানের প্রকৃত বন্ধুই-বা কে আর প্রধান শত্রুই-বা কে? সেকারণে তারা ভারতের পক্ষে দাঁড়িয়ে এককালের বন্ধু পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিতেও দ্বিধা করছে না।

সম্প্রতি আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী নুরউদ্দিন আজিজি নয়া দিল্লি সফরে এসে দেশত্যাগী হিন্দু ও শিখ সমাজের মানুষদের আফগানিস্তানে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গত কয়েক দশকে যারা ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলে গেছেন, তারা যেন আবার আফগানিস্তানে ফিরে আসেন। তালিবান সরকার তাদের পুরোনো সম্পত্তি ও ব্যবসা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

গত মাসে তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমিরখান সুতাক্কি ভারত সফরে এসে আফগানিস্তানের হিন্দু ও শিখদের দেশে ফেরার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবার সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন বাণিজ্যমন্ত্রী নুরউদ্দিন আজিজি। তিনি আরও জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই কাবুল-দিল্লি এবং কাবুল অমৃতসর রুটে মালবাহী বিমান করিডোর চালু হতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ আরও সক্রিয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে পাকিস্তান কিন্তু ভীষণভাবে তালিবানের উপর চটে রয়েছে। তারা তালিবান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে। এমতাবস্থায় ভারত সরকার কূটনীতির মাধ্যমে তালিবান সরকারের পাশে থেকে আফগানিস্তানের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করলে এবং উন্নয়নে অংশ নিলে আখেরে দুই দেশেরই মঙ্গল হবে বলেই কূটনীতিকরা মনে করেন। ☐

বিধানসভা ভোটের আগে বাবরি বিতর্ক!

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আবারও উথাল-পাথাল সৃষ্টি হয়েছে এক ঘোষণায়। মুর্শিদাবাদের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির যখন ঘোষণা করলেন, ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। তখনই স্পষ্ট হয়ে গেল, পশ্চিমবঙ্গ আক্ষরিক অর্থেই ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে একটি গণ্ডগোলের দিকে এগোচ্ছে। এই ঘোষণা শুধু একটা মজহবি শাসন প্রতিষ্ঠার বক্তব্য নয়; এটি গভীর প্রতীকী বার্তা যা সরাসরি আঘাত করেছে এ রাজ্যের হিন্দু সমাজের বিশ্বাস ও আস্থাকে। একজন শাসক দলের বিধায়ক কি এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করতে পারেন দলের পূর্বানুমতি ছাড়া? আর যদি সত্যিই না-ও করে থাকেন, তাহলে দলের ভেতরে এই দায়হীনতার উৎস কোথায়?

গত এক দশকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হলো তাদের মুসলমান তোষণ। এই ঘটনা যেন সেই অভিযোগকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। হুমায়ুন কবিরের ঘোষণার পর দেখা গেছে, এলাকায় বাবরি মসজিদের পোস্টার, প্রচারমাধ্যমে ক্যাম্পেইন, সামাজিক মাধ্যমে সংগঠিত প্রচারণা, যা কোনোভাবেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলে মনে হওয়ার মতো নয়। বরং এটি যেন একটি পরিকল্পিত সামাজিক-রাজনৈতিক দাঙ্গার সংকেত। তৃণমূলের তোষণের রাজনীতি এখনো পুরোদমে জীবিত, বিশেষ করে মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলোতে। এর ফলে রাজ্যে একটি বিপজ্জনক বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে রাজ্য সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কঠোর বার্তা দিচ্ছে, সেখানে দলেরই এক বিধায়ক সংবেদনশীল মজহবি প্রতীক ব্যবহার করে কীভাবে আগুনে ঘি ঢেলে দিচ্ছেন। হিন্দু সমাজের একটি বড়ো অংশ একে দেখেছে তাদের ভাবনা ও বিশ্বাসকে অপমান করার প্রচেষ্টা হিসেবে।

বাবরি একটি অতীতের ক্ষত। অযোধ্যা বিতর্ক ও তার দীর্ঘ আইনি লড়াই, তারপর শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির প্রতিষ্ঠা, ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি সুদীর্ঘ ৫০০ বছরের সংগ্রামের প্রতীক। সেই প্রেক্ষাপটে 'বাবরি মসজিদের প্রতিরূপ'-এর ঘোষণা প্রাকৃতিকভাবেই হিন্দু সমাজের মনে একটি অপমান ও আঘাতের পরিবেশ তৈরি করেছে। তৃণমূলের 'আমরা জানি না' ধরনের প্রতিক্রিয়া এই সমস্যা আরও গভীর করেছে। এটা তাদের একটি পরিচিত প্যাটার্ন।

দলের কেউ বিতর্কিত মন্তব্য করেন, তারপর জনরোষ তৈরি হয়, দল তার দায় অস্বীকার করে কিন্তু বাস্তবিক কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কারণ দল কোনো দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিতে চায় না। হিন্দুদের গঙ্গায় ডুবিয়ে মারার দাবি করার পরেও কি তৃণমূল সুপ্রিমো নিজের বিধায়ককে কিছু বলেছিলেন? না। কারণ, মুসলমান তোষণ। হিন্দুদের ভোট তো ভয় দেখিয়ে অথবা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের লোভে পেয়ে যাবে এই বিশ্বাস তৃণমূল কংগ্রেসের বদ্ধমূল, তাই তারা হিন্দুদের সুরক্ষা, সম্মান বা বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেয় না।

কিন্তু এই প্যাটার্নই হিন্দু সমাজকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, তাদের ধর্মীয় অনুভূতি কখনোই পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের চোখে ভালো নয়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। এই সময়ে এমন একটি ঘোষণার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। উদ্দেশ্যগুলি হলো,

১. **মুসলমান ভোট ব্যাংক :** মুর্শিদাবাদ, মালদা-সহ বহু জেলায় মুসলমান ভোট রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে নির্ণায়ক। অনেকেই মনে করছেন, হুমায়ুন কবিরের এই ঘোষণা সেই ভোটব্যাংককে আরও সংহত করার প্রচেষ্টা।

২. **হিন্দু-মুসলমান সংঘাতকে পুনরুজ্জীবিত করা :** বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে এবং এই ইস্যুকে হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের কারণ হিসেবে তুলে ধরছে। তৃণমূলের একটি অংশ হয়তো ঠিক এটিই চেয়েছিল, মেরুকরণ যত বাড়বে, মুসলমান ভোট ততই সুংগঠিতভাবে তৃণমূলের দিকে থাকবে।

৩. **মাঠ পর্যায়ে বার্তা পাঠানো :** পোস্টার লাগানো, মসজিদের ছবি ছড়িয়ে দেওয়া, এসবই প্রমাণ করে যে 'ব্যক্তিগত মন্তব্য' আসলে একটি সংগঠিত ক্যাম্পেইন। সমস্ত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি প্রশ্ন ঘুরছে, মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেননি কেন? একটি সংবেদনশীল ইস্যুতে দলের শীর্ষনেত্রী চুপ থাকলে, তা প্রকৃতপক্ষে নীরব সমর্থন নাকি অস্বস্তিকর দায়মুক্তি, তা নিয়ে এখনই জোরালো আলোচনা চলছে। হিন্দু সমাজের একটি বড়ো অংশ এটাকে দেখছে তাদের ভাবনাকে সম্মান না দেওয়ার রাজনৈতিক মনোভাব হিসেবে।

এই বিতর্কের প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই, এটি শুধু একটি মসজিদের প্রতিরূপ নয়; এটি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবের দর্পণ। একদিকে দাবি করা হয় 'শাসন ও উন্নয়নের রাজনীতি', অন্যদিকে দেখা যায় তোষণ, জেহাদি-রাজনীতি, মজহবি মেরুকরণ। এটি হিন্দু সমাজের আস্থা ও বিশ্বাস দুটোকেই আঘাত করছে। আর একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, যে এই ঘটনাই আবার প্রমাণ করল এরাজ্যে মজহবের নামে রাজনীতি শুধুই অব্যাহত নয়; বরং আগামী নির্বাচনের প্রাক্কালে তা আরও তীব্র হবে। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৪৬)

গল্প

একবার রাজা লক্ষ্মণ রাও ভোঁসলের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছিল। আপ্যায়নের সময় দেখা গেল পানের বাটার চুন ফুরিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে একজনকে আদেশ দেওয়া হলো— 'চুনা লাও', 'চুনা লাও', কিন্তু চুন আর আসছে না। ডাক্তারজী অবস্থাটা উপলব্ধি করলেন। তিনি এই বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত, তাই সোজা ভেতরে গিয়ে চুপচাপ চুন এনে পানের বাটায় রেখে দিলেন। কিন্তু তারপরেও কিছুক্ষণ ধরে চলতে লাগলো— 'চুনা লাও', 'চুনা লাও', এই জন্য প্রত্যেক বৈঠকে ডাক্তারজী বলতেন— 'যে কাজ করতে বলা হয়েছে সেটা করতে হবে, কিন্তু তার ঢোল পেটাবার প্রয়োজন নেই এবং এ কথা চিন্তা করা উচিত নয় যে আমি একা যদি কাজ না করি তাতে কী ক্ষতি হবে'! এই প্রসঙ্গে তিনি দুধের পুকুর তৈরি করতে জলের পুকুরের কাহিনিটির খুব উল্লেখ করতেন। হিন্দুদের 'কী করব আমি একা' বলে পলায়ন মনোবৃত্তির প্রেক্ষিতে একটি বাস্তব ঘটনার খুব উল্লেখ ডাক্তারজী করতেন। ঘটনাটি মহারাষ্ট্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

একবার এক জনসভা চলাকালীন একজন শ্রোতার পায়ে ব্যাঙের মতো কিছু ঠেকায় দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল। তার মধ্যে একজন 'সাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠলে পাশের লোকজন পালাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে কে কার ঘাড়ে পড়বে, বাঁচার তাগিদে মুহূর্তে সব ছুটতে লাগল। 'কী হয়েছে'— কারও জিজ্ঞাসার সময় নেই। হাজার খানেক লোকের মধ্যে কারও চটি, ছড়ি, মাথার টুপি, চাদর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে থাকলো। পাঁচিল টপকে দ্রুত পালাতে চোট গেল অনেকে। দৌড়াদৌড়িতে কিটসন লাইটের আলোগুলো পড়ে নিভে গেল। সে এক বীভৎস পরিত্রাহি অবস্থা। মুহূর্তে মাঠ ফাঁকা, ভাব এমন যেন সকলকে বাঘে তাড়া করেছে। এই ঘটনার দিন ডাক্তারজী নাগপুরের বাইরে ছিলেন। 'মহারাষ্ট্র' পত্রিকায় ঘটনার বিবরণ পড়ে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন— 'শ্রোতাদের কথা বাদ দিন কিন্তু আপনারা গিয়ে সব সামলালেন না কেন?' প্রতেকের মুখে একই কথা শুনলেন— 'আমি একা কী করতে পারতাম?'—'আমি একা কী করব?'।

এই উদাহরণ দিয়ে হিন্দুদের অবস্থার বর্ণনা করে ডাক্তারজী বলতেন— হিন্দুদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাসের অভাব দূর করার জন্য 'আমি' স্থানে 'আমরা পয়ত্রিশ কোটি' এই রাষ্ট্রীয় একাত্ম শক্তির মনোভাব সকলের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

(৪৭)

প্রথম প্রতিজ্ঞা বিধি

নাগপুরে সঙ্ঘের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাছাড়া এতদিন মুসলমানদের দাঙ্গা প্রবণতায় হিন্দুরা যে বিপর্যস্ত হতো তার থেকে মুক্তিলাভে সঙ্ঘ তথা ডাক্তারজীর জন্য তাদের মনে আলাদা একটা আসন তৈরি হয়েছিল। ডাক্তারজীও শহরের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের একত্রিত করে বক্তব্য রাখতেন। সকলের সামনে ডাক্তারজী যখন জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখতেন, পরাধীন ভারতে ইংরেজদের কুটশাসন, ভারতবাসীর উদাসীনতা, স্বার্থান্ধ মানসিকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে হৃদয়ের আবেগে যখন তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠতো তখন শ্রোতাদের মনে এক কর্তব্য, শ্রদ্ধা, জাগৃতির সায়রে দ্রবিত হতো। এমন একটা বৈঠক শেষে ডাক্তারজী পকেট থেকে গৈরিক ধ্বজ বের করে দণ্ডে লাগাতেন এবং সকলকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের অনুরোধ করতেন। ধীরে ধীরে একসময় এই বৈঠক স্থানগুলি সঙ্ঘের শাখায় পরিণত হতো। এই প্রতিজ্ঞা ছিল নৈমিত্তিক সাধারণ মানুষদের জন্য ডাক্তারজীর এক ব্যবস্থা। স্বয়ংসেবকদের জন্য বর্তমান অনুরূপ প্রতিজ্ঞা বিধি তখনো শুরু হয়নি। নাগপুরে মুসলমান দাঙ্গার পরে ধন্তোলী অঞ্চলে দ্বিতীয় শাখা শুরু হয় এবং এই সময়ের আজন্ম সেবাব্রত ও বীরব্রতের কথা স্মরণ করে হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণের ও তার অভিব্যাক্তির জন্য তন-মন-ধন দ্বারা কর্তব্যরত থাকার কথায় শ্রীপরমেশ্বর ও মহান পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে সংকল্প গ্রহণ করা হয়। বলা হয়, এই প্রতিজ্ঞার ভাষা ডাক্তারজীর বিপ্লবী দলের প্রতিজ্ঞার সঙ্গে নাকি অনেকটা মিল ছিল। সঙ্ঘের বিধিবৎ 'প্রতিজ্ঞা' পদ্ধতি শুরু হয় ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে, জায়গাটা ছিল নাগপুর অমরাবর্তী রোডে পাহাড়ি অঞ্চল, ঘন গাছ পালায় পরিপূর্ণ। নিরানব্বই জন নির্বাচিত স্বয়ংসেবকদের নিয়ে ডাক্তারজী এখানে এলেন এবং পাহাড়ের পূর্বদিকে ঢালে গৈরিক পতাকা উত্তোলন করে তার সম্মুখে প্রতিজ্ঞার এক ভাব গম্ভীর পরিবেশ তৈরি করে প্রতিজ্ঞা কার্য সম্পন্ন করেন। এই প্রতিজ্ঞা প্রক্রিয়ায় ডাক্তারজী এক পঙ্ক্তি করে বলতেন এবং একজন করে স্বয়ংসেবক ধীরভাবে প্রতিজ্ঞা শব্দ অনুধাবনের মধ্য দিয়ে তা উচ্চারণ করতো। একে একে নিরানব্বই জন স্বয়ংসেবক এই ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে হিন্দু রাষ্ট্রের রক্ষা ও তার পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যে এই মহামন্ত্রের সার্থকতার পথে এগিয়ে চলল। সঙ্ঘ মহীরুহের শাখা প্রসারিত হতে থাকল দিগ্‌দিগন্তরে।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস